মাতৃভাষা পত্রিকা

বর্ষ ৯ম ও ১০ম ।। মাঘ ১৪৩১

ISSN: 2618-0103 ।। ISSN-L: 2618-0103

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট

ঢাকা ১০০০

মাতৃভাষা পত্রিকা
ভাষা বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা
বর্ষ ৯ম ও ১০ম ।। মাঘ ১৪৩১ ।
Matribhasha Patrika Vol. 9-10 Magh 1431
প্রকাশকাল:
মাঘ ১৪৩১/ফেব্রুয়ারি ২০২৫
(Published in Magh 1431/February 2025)

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
পরিচালক, আমাই

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই

যুগ্ম সম্পাদক
খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্
উপপরিচালক (প্রকাশনা), আমাই

সহযোগী সম্পাদক
ড. নাজনিন নাহার
সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), আমাই

সম্পাদক পরিষদ
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক ও সম্পাদক, মাতৃভাষা পত্রিকা, আমাই
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি
ড. হানা রুথ থমসন, প্রাক্তন প্রভাষক, SOAS, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালী, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তপন কুমার বাগচী, পরিচালক (ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ), বাংলা একাডেমি
ড. মনিরা বেগম, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শারমিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই
আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই
খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্, উপপরিচালক (প্রকাশনা), আমাই
ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), আমাই

প্রচ্ছদ: বরুন বর্মন

প্রচ্ছদের শিরোনাম: সব্যসাচী হাজরা

মূল্য: ২০০/- US $ 2

ডিজাইন ও মুদ্রণ: ইনোভা কমিউনিকেশনস, আরামবাগ, ঢাকা।

ষাণ্মাসিক মাতৃভাষা পত্রিকার প্রকাশক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ (www.imli.gov.bd)

@ স্বত্ব: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
ISSN: 2618-0103, ISSN-L: 2618-0103

মাতৃভাষা পত্রিকা

ভাষা বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

সূচিপত্র

বাংলা শব্দের প্রায়োগিক আলোচনায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট **৫**
মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

বাংলা ফন্টের উন্নয়নে প্রযুক্তির যোজনা **২১**
খান মাহবুব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় পদাণু: ব্যবহার ও বৈচিত্র্য **৩৩**
শুভেন্দু সাহা

আনিসুজ্জামান ও বাংলা ভাষাচর্চা **৫১**
শ্যামল কান্তি দত্ত

তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ: সমাধানে কিছু প্রস্তাবনা **৬৪**
আতাউর রহমান সায়েম

তথ্যপ্রযুক্তি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলা বানান **৮২**
আল মাকসুদ

সিলেবল-তত্ত্ব ও চাক ভাষার সিলেবল সংগঠন: একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ **৯৪**
মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব ও বর্তমান বাস্তবতা **১২৭**
স্বাক্ষার ব্লেইজ গমেজ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা পত্রিকায় (বাংলা) প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম **১৩৯**

বাংলা শব্দের প্রায়োগিক আলোচনায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান *

Abstract: The relationship between culture and the usage of words in a language is inseparable. Words are the basic components of language. These components are applied based on the cultural context. It is noteworthy that this article makes an attempt to investigate and elucidate how words are used in a culture. This is a theoretical study. This study uses a descriptive methodology and analyzes the use of Bengali words, the cultural use of words and various areas of the practical use of words. Political, socio-economic, religious, cultural, etc., contexts play an effective role in the use of words. It is easy to understand the intimate connection between language and a community's history and customs. This comprehension is evident in the way Bengali words are used. The changes in culture that occur over time inevitably affect the word scheme. Such investigation is the main motivation for the current study. Above all, there is an attempt to uncover diverse aspects of cultural context in the practical discussion of words.

মূলশব্দ (Keywords): বাংলা শব্দ, প্রয়োগ, সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শ্রেণিকরণ।

* Dr. Mohammad Ashaduzzaman, Professor, Department of Linguistics, University of Dhaka

১. ভূমিকা

ভাষার চারটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে শব্দ অন্যতম। এই প্রপঞ্চের সাহায্যে গঠিত হয় বাক্য। আর এই বাক্যই ভাষার বৃহত্তম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। বাক্যের অর্থপূর্ণ এককের সামবায়িক রূপ হলো ভাষা। ভাষা ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। 'কারণ ভাষায় সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব বিদ্যমান' (লেখা, ২০১৪:২৯)। সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারের ভিন্নতা লক্ষণীয়। বাংলা শব্দের প্রায়োগিক ব্যাখ্যার্থে তাই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। 'বস্তুত, শব্দের কোনো অর্থ নেই। আছে শুধু ব্যবহার। শব্দমাত্রই প্রসঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রসঙ্গ থেকেই শব্দের ব্যবহার। শব্দ বস্তু ও ভাব বহন বা প্রেরণ করে না, বহন ও প্রেরণ করে ঐ বস্তু বা ভাবের চিত্ররূপ, যার ব্যবহারিক নাম শব্দার্থ বা শব্দের অর্থ (খান, ২০১২: প্রসঙ্গ-কথা)। দার্শনিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের পুরোধা ব্যক্তিগণ শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সংস্কৃতির সাযুজ্য নির্মাণ করেছেন।

২. গবেষণার বিষয় শনাক্তকরণ

ভাষার মৌলিক উপাদানের মধ্যে শব্দ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শব্দ সমবায়ে বাক্য তৈরি হয় এবং এই বাক্যই ভাষার বৃহত্তম উপাদান। শব্দের সঙ্গে সংস্কৃতির অন্বিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রতিটি শব্দই একটি জনগোষ্ঠীর ভাব ও ভাবনা প্রকাশ করে থাকে। শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে তাই ভাষা ব্যবহারকারীর রয়েছে আত্মিক সংযোগ। নিত্যদিনের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের গুরুত্ব অসীম। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের। প্রায় দেড় দশকের বাংলা ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতির সংযুক্তির গুরুত্ব অনেক। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা শব্দের ব্যবহারিক আলোচনার সঙ্গে এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রেক্ষাপট নির্মাণসহ নানা প্রপঞ্চ আলোচিত হয়েছে। বিষয় শনাক্তকরণে সংস্কৃতির সঙ্গে শব্দের সংযুক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে।

৩. গবেষণা উদ্দেশ্য

বক্ষ্যমান গবেষণায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের আলোচনায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের মাধ্যমে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে বাংলা সংস্কৃতির পরিবর্তনের ইতিহাস-পর্বে ভাষার শব্দের প্রয়োগগত দিক বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। তবে বাংলা

সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ভাষার শব্দের ব্যবহারের প্রায়োগিকতা নির্ভর আলোচনা সুলভ নয়। তাই এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিদ্যমান।

৫. গবেষণা-পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি বর্ণনামূলক। এর উপাত্তের উৎস দ্বৈতীয়িক। বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে

৬. সংস্কৃতি ও শব্দের পারস্পরিকতা অনুসন্ধান

মানুষের সার্বিক জীবনব্যবস্থাকে এক কথায় বলা যায় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রকাশ ও বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। মানুষ ভাষার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান প্রদান করতে সমর্থ হয়। ভাষার চারটি মৌলিক উপাদানের (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ) মধ্যে শব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। ভাষার এই শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সংস্কৃতির চারটি মৌলিক উপাদানের (ভাষা, মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রতীক) মধ্যে ভাষা ও প্রতীক এই উপাদান দু'টির সঙ্গে শব্দের আলোচনার সাযুজ্য বিদ্যমান। শব্দের সমন্বয়েই বাক্য তৈরি হয় এবং ভাষার বাক্যই ভাব প্রকাশ করে থাকে। কোনো ভাষার শব্দ মানুষের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। দানেশি বলেছেন–'It is no exaggeration to say that the very survival of civilization depends on the preservation of words' (Danesi, 2004: 20)। শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সমাজের সংশ্লিষ্টতা গুরুত্ববহ। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

> সমাজ যে অবস্থায় থাকুক তার একটি কাঠামো থাকবে এবং সমাজে কিছু নিয়মাবলি থাকবে। যদি তা-ই থাকে, তাহলে ভাষাকেও কিছু কিছু সামাজিক নিয়মাবলি মানতে হবে। ভাষা ও পরিবেশের সম্পর্কও থাকবে চিরদিন-এটাও হচ্ছে সমাজভাষাবিজ্ঞানের যৌথ প্রেরণা যা সমাজ বিশ্লেষণে বা নানাবিধ সামাজিক তত্ত্বের সহায়ক জ্ঞাতিশাস্ত্র হিসেবে রূপ নিতে পারে (হুমায়ুন, ১৯৯৩: ৩৬)।

৭. শব্দ-ব্যবহারে সংস্কৃতির প্রয়োগ

ভাষার শব্দমাত্রই সংস্কৃতি নির্ভর; অর্থাৎ সংস্কৃতির নিয়ম, বিধি-নিষেধ অনুসরণ করেই এসব শব্দাবলি কোনো নির্দিষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংস্কৃতিভেদে শব্দের ভূমিকা ভিন্ন হয়ে থাকে। 'Although it is likely that all languages have words the social role of words differs widely (Dixon and

Aikhandvald, 2007: 12) সত্যিকার অর্থে যথার্থ সংজ্ঞাপন বলতে কতগুলো শব্দের উপযুক্ত ব্যবহারকে বুঝায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দের মূল অর্থ এবং সংস্কৃতি প্রভাবিত ব্যঞ্জনার্থ– এ দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংজ্ঞাপন সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

> The point of obvious if we think of words that are used by particular segments of our society. Such as BONNY (used by scots) and GOUSH (used by ex-teenagers of a certain age). But it's important not to lose sight of the fact that simply speaking English link us to a social category, and general accent differences that are audible on most words locate the speaker in one particular English-speaking country. Languages are fundamentally badges of social-group membership, so it is essential to be able to assign social properties not only to individual lexemes, but also to the entire language (Hudson 2007c. 239-46).

কাজেই সত্যিকার সংজ্ঞাপনের জন্য একজনকে এ দ্বিবিধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে স্যাপির-হোর্ফের 'ভাষিক আপেক্ষবাদে'র উল্লেখ করা যায়। (নাথ ১৯৯৯: ৫২) উল্লেখ করেন-

> ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদের মতে, কোনো ভাষীর ভাষা নির্ধারণ করে দেয় তার জগৎ সম্বন্ধে ধারণা বা বিশ্ববীক্ষা (weltanschauung)। অর্থাৎ ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং ব্যাকরণ ভাষীকে জগৎ চিনতে শেখায়। একে স্যাপির-হোর্ফ উপাত্ত (Sapir-Whorf hypothesis) বলা হয়ে থাকে। এডওয়ার্ড স্যাপির প্রথমে একে সূত্রায়িত করেন, পরে তার ছাত্র বেঞ্জামিন লি হোর্ফ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। স্যাপিরের মতে ভাষাই সামাজিক বাস্তবতার (social reality) নিয়ন্ত্রক। স্যাপির ভাষা এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক ক্ষেত্র নিবদ্ধ রাখেন শব্দের স্তরে, তার ছাত্র তা বিস্তৃত করেন, ভাষার সংগঠনের তথা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে।

স্বদেশ ভাষার শব্দভাণ্ডারকে তিনভাগে ভাগ করেছে-

ক) মূল শব্দ: শব্দের মূল ভাণ্ডারের সাহায্যেই নির্ণয় করা হয়েছে ভাষাবংশ। স্বদেশ দাবি করেছে, এসব শব্দ প্রতিটি ভাষায় ব্যবহৃত হয় এমন মূলশব্দ যেমন-

পাখি, কুকুর, রক্ত, হাড়, পানি, খাবার ইত্যাদি। প্রতিটি ভাষার মৌলিক কিছু শব্দ রয়েছে, যে শব্দগুলো সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। কোনো একটি ভাষার সংগঠন জানার জন্য সে ভাষার শব্দ সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজন। সাধারণত গবেষণা কাজে বিষয়ভিত্তিক ২১০টি অথবা ২৫০টি মৌলিক শব্দ সংগ্রহ করা হয় (উল্লেখ, চৌধুরী, ২০১৮: ২২৭)।

খ) কিছু সাংস্কৃতিক শব্দ: সাংস্কৃতিক শব্দসমূহ সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোনো বিশেষ প্রজাতির প্রাণী বা গাছ বোঝাতে এসব শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

গ) ভাষার মূল শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে এরপর সংশ্লিষ্ট থাকে সহোদর (cognates) কিছু শব্দ। ধ্বনিপরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে এসব শব্দের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায় (Swadesh, 1951: 18)। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে একাধিক ভাষার মধ্যে এক বা একাধিক শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ করে ভাষাগুলোর একটি সাধারণ বংশগত উৎস সম্পর্কে অনুমান (hypothesis) করা হয়। পরে আরও শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। যদি অনেক সাদৃশ্য থেকে যাচাই করে অনুমানটি টিকে যায় তবে ভাষাগুলোর অভিন্ন উৎস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয়। একাধিক ভাষার যেসব শব্দের মধ্যে রূপগত বা অর্থগত মিল থেকে সাদৃশ্য অনুমান করা হয়, সেসব শব্দ যদি পরীক্ষার পরে একই উৎস থেকে জাত বলে প্রমাণিত হয়, তবে সেগুলোকে সহোদর শব্দ (Cognate words) বলে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূল প্রতিষ্ঠা হয়েছে সহোদর শব্দের উপর ভিত্তি করে।

কোনো বিশেষ ভাষার শব্দ হিসেবে সাংস্কৃতিক শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। একটি জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে এর পার্থক্য বিস্তর। এমনকি এ ধরনের শব্দ ওই ভাষিক সমাজে নিত্যদিনের ভাষায় প্রয়োগ নাও হতে পারে। মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় দিক নির্দেশেই এসব শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এ ধরনের শব্দ ধর্ম, প্রথা, বিশ্বাস এমনকি খাদ্যের প্রকার নির্দেশে প্রয়োগ হতে পারে (Baker (1992: 21)। সাংস্কৃতিক শব্দের ব্যাখ্যা এভাবেও উল্লেখ হয়েছে-

> Cultural word is “art, literature, music, or other intellectual expression of a particular society or time”. To conclude, cultural word is a specific word for special kinds of “things”, “events” or “customs (Hornby, 1995: 285).

অনেকেই সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন জীবনপদ্ধতি হিসেবে এবং তাঁরা ভাষাকে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক প্রকাশের উপায় বলে গণ্য করেছেন। নিউমার্ক সাংস্কৃতিক শব্দকে কয়েকটি অভিধায় বিভক্ত করেছেন। প্রথমত, বাস্তুসংস্থান, যা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সমবায়ে গঠিত; এটি মূল্যবোধ মুক্ত, রাজনৈতিকভাবে এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য। সহজেই অন্যান্য সাংস্কৃতিক শব্দ থেকে স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা যায়। অধিকাংশ সাংস্কৃতিক শব্দ বস্তুগত যা খাদ্য, ঘরবাড়ি, পরিবহণ, কাপড়-চোপড়, যোগাযোগে ব্যবহৃত হয় (নিউমার্ক, ১৯৮৮)। সাংস্কৃতিক শব্দের শ্রেণিকরণ শব্দের প্রয়োগ ও বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল (Hornby, ১৯৯৫)।

৮. বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তর ও ভাষার শব্দের সংযোজন

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতি পরিবর্তন হয়। এর প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায় ভাষার ক্ষেত্রে। কারণ বিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভাষার সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা মূর্ত হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাও সেই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই অগ্রসরমান। বিশ্বায়নের যুগে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ বিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়নের কারণে বাংলা ভাষাও দ্রুত বদলে যাচ্ছে (রশিদ, ২০২০)।

সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কোথায় এবং কবে বসতি স্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে লাতিন-গ্রিক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায়, বাংলার উত্তরাংশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে পুণ্ড্রনগর (বর্তমানে মহাস্থানগড়) ছিল এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র। মৌর্য শাসন থেকে গুপ্ত শাসন পর্যন্ত (খ্রিস্ট্রীয় চতুর্থ শতাব্দী) বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়।

আর্য-পূর্ব যুগে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, তিব্বতি এবং বর্মিরা এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তাঁদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আজও লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষায় অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। বাংলায় অনার্য প্রভাবের স্বরূপ ও উৎসের সন্ধানে বাংলা ও বাংলার মানুষের সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের সঠিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে অনার্য গোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় (সরকার, ২০১৩)।

আর্যরা এদেশে প্রবেশ করে প্রায় ২৫০০ বছর আগে। তাঁরা এদেশের মানুষকে অসুর, ম্লেচ্ছ, স্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছে। বাংলার লোকজন প্রথমে তাঁদেরকে

ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেনি এবং আর্য সংস্কৃতিকে উপর্যুক্ত অভিধায় অভিহিত করা তার প্রমাণ। খ্রিস্টীয় চার শতক থেকে বাংলায় ক্রমাগত আর্যীকরণ শুরু হয় এবং গুপ্ত শাসকগণের মাধ্যমে তা বেগবান হতে থাকে। তবে এ শাসনকালে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় ছিল। গুপ্ত শাসকগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং একই সময়ে তাঁরা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রসারে উদ্যোগী হন। এ সময় জাতিভেদ প্রথা বিশদভাবে প্রচলিত ছিল। গুপ্তোত্তরকালে বাংলায় শৈবধর্মপ্রচারক রাজা শশাঙ্কের নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তম শতকের প্রারম্ভে তিনি গৌড়রাজ্যে ক্ষমতাসীন হন বলে ধারণা করা হয়। শশাঙ্কের পরবর্তী শতাব্দী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক হতাশার যুগ। কোনো স্থায়ী শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বলে এসময় অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাংলার সংস্কৃতি বিকাশে অন্তরায় হয়ে ওঠে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এ যুগকে তাই 'মাৎস্যন্যায়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরপর শুরু হয় পালবংশের গোড়াপত্তন। উল্লেখ্য যে, মৌর্য শাসনামলে ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন যা পালযুগের (৭৫০-১১৫০) চারশত বছরের শাসনামলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা এ প্রথাকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

সেন রাজাদের শাসন (১০৯৮-১২২৩ খ্রি.) ব্যবস্থা বাংলার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে প্রভাব ফেলে। তাঁদের মাধ্যমে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্মণ্যদের নিয়ন্ত্রণ হয় আরও সুসংহত। ফলে বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম পতনের পথও সুগম হয়। তাঁরা আন্তঃবিবাহ ও আন্তঃভোজন থেকে বিরত থাকে। হিন্দুদের মধ্যকার বর্ণভেদ প্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ, বৈশ্য এবং শূদ্র) প্রকটিত হতে দেখা যায়। পুরো সেনযুগ ধরে হিন্দু সংস্কৃতির উত্থানপর্ব লক্ষ করা যায়।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্মের প্রভাব সুদৃঢ় হয়। এ প্রভাবের কারণে বৌদ্ধ ও হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রসারের বহু পূর্ব থেকেই আরব ব্যবসায়ী, তুর্কি, আফগান বিজেতাগণ এবং পারস্যের ধর্মপ্রচারকগণ এ অঞ্চলে এসেছিলেন। চট্টগ্রামে মুসলিম সুফিদের কেন্দ্রস্থল ছিল। তাঁরা স্থানীয় লোকজনকে ধর্মান্তকরণে ভূমিকা পালন করেন। খলজির বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে এ ধর্ম তথা ফারসি ভাষার রাজত্ব (১২০৪-১৮৩৫) চলতে থাকে প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর। তবে শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) বৈষ্ণববাদের বিস্তার বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তন সূচিত করে।

ষোল শতকের শুরুতে ইউরোপীয় বণিকগণ এ অঞ্চলে আসতে শুরু করে। এদের মধ্যে পর্তুগিজরাই প্রথমে বাংলাদেশে আগমন করে বলে তথ্য প্রমাণ আছে।

১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা এদেশে প্রথম আগমন করেন। পূর্ববাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা ছড়িয়ে পড়ে। পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দ্য আসসুম্পসাউ গাজীপুরের ভাওয়াল গড়ে বসে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন ১৭৩৪ সালে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে। তাঁদের আগমনে এদেশের সাংস্কৃতিক আবহে পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজে তার প্রমাণ মেলে। নানা প্রকার রসালো মিষ্টি ও শুকনো মিষ্টি তৈরিতে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিভিন্নধর্মী আচার তৈরিতে তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। এদেশে আচারের প্রচলনও তাঁদের দ্বারাই শুরু হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের অবদান স্বীকার্য। বহু পর্তুগিজ শব্দ বাংলায় অনুপ্রবিষ্ট। এরপর ওলন্দাজ, ডাচ, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতির সমারোহ বাংলার সংস্কৃতিকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছে। স্থানীয় জনগণের সাথে সংজ্ঞাপন, বিয়ে ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ইংরেজি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটতে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁরা বাংলায় শক্ত ঘাটি নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলা মসনদে অবতীর্ণ হলেও এদেশে তাদের প্রভূত রাজত্ব শুরু হয় ১৮৩৫ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা ঘোষণার মাধ্যমে। ইংরেজরা ১৯০ বছর শাসনের মাধ্যমে এদেশের জনগণের সংস্কৃতির মৌলিক রূপের পরিবর্তনে ভারবাহী ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ ও ইংরেজ সমর্থিত বাঙালিরা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁদের সংস্কৃতি চর্চায় অভিনিবিষ্ট হয়। ফলে এদেশে একটা বাঙালি-ইংরেজ শ্রেণি সৃষ্টি হয়। তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে ও অফিস আদালত, সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার লেখায় ইংরেজি লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন বেশি। এ প্রক্রিয়ায় ইংরেজি ভাষা ও বাংলা ভাষা পরস্পরের গাত্র স্পর্শ করে। বাঙালির বাক্যবন্ধে ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। তখনকার দিনের একটি বহুকথিত বাক্যবন্ধের নজির উপস্থাপন করা হলো-

> 'আমার father কিছু unwell হওয়াতে Doctor কে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। physic বেশ operate করেছিল, four times motion হলো অদ্য কিছু better বোধ করছেন' (মুসা ও ইলিয়াস, ১৯৯৪: ২২৭)।

ইংরেজি সংস্কৃতির এই একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় এ বাংলায় সংঘটিত হয় ১৭৭২-১৮৩৩ কালব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ

আন্দোলন। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, বলাকি শাহর বিদ্রোহ, আগা মোহাম্মদ রেজার বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রধান। এসব আন্দোলনসমূহে স্বজাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর বাংলায় শুরু হয় সংস্কার আন্দোলন। পলাশী যুদ্ধে বাংলার নবাবি শাসন ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে বন্দি হওয়ার পর বাংলাদেশের কলা-কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা দেয় নিদারুণ অবক্ষয়। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান রাজা রামমোহন রায় ও হাজী মুহম্মদ শরীয়তুল্লাহ। এরপর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৩-১৯০৮ সালের স্বদেশি আন্দোলন, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯১১-১৯২৮ সাল অবধি লক্ষ্ণৌ চুক্তি, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং বেঙ্গল প্যাক্ট প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। এরপর ১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বড়ো পরিবর্তন আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি অঞ্চল পৃথক হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সংস্কৃতির রাজত্ব সুদৃঢ় হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার গতিশীলতাকে বেগবান করে বাংলার মানুষ। এর ফলে, ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিজস্ব ধারায় চলার কথা। কিন্তু এই স্বাধীনতার সঙ্গে মানুষের মনের স্বাধীনতার যোগসূত্র তৈরি হয়নি। ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতিতে ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি কিংবা আরবির আধিপত্যবাদ প্রায়শই লক্ষ করা যায়। দেশের সংস্কৃতির মূল উপাদান তাই পরিবর্তিত হয়েছে কিংবা সাংস্কৃতিক বিস্তার লাভ করেছে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই বিকশিত বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার অন্বেষণ তাই একান্তই আবশ্যক।

৯. বাংলা সংস্কৃতিতে শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্মাণ

৯.১ *সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি*: সাধারণত দুটি সমাজের সংস্কৃতি একে অপরের সংস্পর্শে এসে একে অপরকে প্রভাবিত করে। এই কাছে আসা যত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে সংস্কৃতির আদান-প্রদান তত বেশি হবে। এর মাধ্যমে একে অপরের সংস্কৃতির কিছু না কিছু গ্রহণ করবে। সংস্কৃতির এই চলমান গতিধারা এবং এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে সংস্কৃতির প্রসার লাভকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলে। অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক

সংমিশ্রণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রসার বা ব্যাপ্তি ঘটে। বিশ্বায়নের ফলে এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গেছে।

৯.২ *সাংস্কৃতায়ন*: নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়াকে সাংস্কৃতায়ন বলা হয়। আমাদের দেশ বহুবার বহিরাগত শাসক দ্বারা শাসিত হওয়ায় এখানে সাংস্কৃতায়ন প্রবল। ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শই সাংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। যেমন: ইংরেজরা প্রায় দুইশ বছর আমাদের শাসক ছিলো বলে অনেক ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় মিশে গেছে।

৯.৩ *সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ*: আত্তীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অন্যের সংস্কৃতি আয়ত্ত করে। যেমন: মানুষ যখন কোনো নতুন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করতে আসে তখন সেখানকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এক কথায় সমগ্র জীবনধারার সাথে আত্তীকৃত হতে চেষ্টা করে। এভাবে একসময় তা আত্তীকরণ হয়ে যায়। যেমন: জীবিকার প্রয়োজনে, বৈবাহিক কারণে অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিজ এলাকা থেকে স্থানান্তর হলে মানুষ ঐ এলাকার সংস্কৃতির সাথে নিজেকে আত্তীকরণ করার চেষ্টা করে।

৯.৪ *সাংস্কৃতিক আদর্শ*: প্রতিটি দেশ বা সমাজের রয়েছে নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ। সাংস্কৃতিক আদর্শ বলতে কোনো দেশ বা সমাজের মানুষের সংস্কৃতির ধরনকে বোঝায়। এগুলো হলো- আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক, বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, লোককাহিনি, সংগীত, লোককলা ইত্যাদি। কোনো দেশ বা সমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শের মাঝে ঐ দেশ বা সমাজের মানুষের জীবনপ্রণালি ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। এই আদর্শের কারণে সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় ।

৯.৫ *প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন*: আধুনিক প্রযুক্তি বা বস্তুগত সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সমাজে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে গোটা বিশ্ব এখন একটি বিশ্বপল্লিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে যোগাযোগ প্রক্রিয়া অনেক উন্নত হয়েছে। এখন ঘরে বসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের খবর জানা যায়। এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে। অনুন্নত সংস্কৃতি দ্রুত উন্নত সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করছে। এভাবে প্রযুক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতিই বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার মর্মমূলে আবহমান বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় প্রোথিত। যথার্থ

পরিকল্পিত আধুনিক নগরায়ণ এখনো এ দেশে হয়নি। গ্রামীণ সমাজ এবং সভ্যতার স্মৃতি ও ছাপ এখনো এই অপরিণত নগরগুলো বহন করে চলেছে। জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতিই সংস্কৃতির নিয়ামক।

লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে সুদূর অতীতের টোটেম, ট্যাবু ও জাদুবিদ্যার সম্পর্ক অতি নিবিড়। সংকট-শঙ্কা-অমঙ্গল দূরীকরণের পন্থা-পদ্ধতির সঙ্গে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের গভীর যোগ। ব্রত-মানত-বশীকরণ-জাদু-মন্ত্র-ঝাড়ফুঁক-টোটকা-তাবিজ ইত্যাদির মাধ্যমে আধি-ব্যাধির নিরাময়, ইচ্ছাপূরণ ও মুশকিল আসানের চেষ্টা চলে। এ ক্ষেত্রে যে আচার-পদ্ধতি, তা অনেকাংশেই কোনো ধর্মীয় রীতিনীতি বা শাস্ত্রাচার অনুসরণ করে না। লোকবিশ্বাস ও সংস্কারে ধর্মের শাসন-গণ্ডি হামেশাই অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

বাংলার লোকজীবনে আবাস-আসবাব, খাদ্য-পরিধেয়-প্রসাধন-অলংকার-তৈজসপত্রও মূলত এক। খড় বা শণের আবার স্থানবিশেষে টালি বা ঢেউটিনের দোচালা ঘর, পাটকাঠি বা কঞ্চির বেড়া, একপাশে গোয়ালঘর, একচিলতে উঠোন, চারপাশে গাছগাছালির গ্রামীণ মানুষের বাস্তুগৃহের এই হলো সাধারণ ছবি। মাদুর-কাঁথা, বাঁশের মাচা কিংবা মাটির মেঝে শয়নের উপকরণ।

ব্যবহারের তৈজসপত্রের মধ্যে মাটির হাঁড়ি-পাতিল-সানকি-কুঁজো, কাঁসা-পিতলের থালা-বাটি-ঘটি-ঘড়া; এসবই প্রধান। কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভক্ষদ্রব্য বাদে বাঙালি সমাজের খাদ্যাভ্যাসও প্রায় অভিন্ন। লোকায়ত বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল এক ধুতি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা, ফতুয়া ইত্যাদি। আর মোটা সুতার তাঁতের শাড়ি গ্রাম্য রমণীর সর্বজনীন আটপৌরে পোশাক। কোনো কোনো অঞ্চলে বিবাহিত মুসলিম রমণীদের মধ্যে শাঁখা-সিঁদুর ব্যবহারের চলও আছে।

প্রমোদ-বিনোদন-ক্রীড়ার ক্ষেত্রেও সম্মিলিত অংশগ্রহণের বাতাবরণ যেমন অনুকূল, তেমনি সুযোগও ছিল অবারিত। নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা, দাড়িয়াবান্ধা কিংবা হাডুডু এসব লৌকিক ক্রীড়ার রূপ ছিল সর্বজনীন। মেলা কিংবা নবান্নের উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলার প্রায় সব লৌকিক মেলাই ধর্মাশ্রিত, তা সাধু-গুরুর জন্ম-মৃত্যু, পূজা-পার্বণ, রথ-স্নানযাত্রা কিংবা ঈদ-মহররমকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উপলক্ষ্য ধর্মীয় উৎসব হলেও মেলার মেজাজ-চেহারা কিন্তু পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ, আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনায় তা লালিত–

> An influencial article on language diversity written at the beginning of the 1970s concluding by claiming that a planner who insists on preserving cultural lingusitc pluralism had better be ready to sacrifice economic progress (Nettle and Romaine, 2017: 89).

১০. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেণিকরণ

ভাষার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেণিকরণ করা সম্ভব। আইয়ুব (২০০৮) এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> ভাষার মাধ্যমেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের শ্রেণিকরণ সম্ভবপর, অন্য কোনোভাবে নয়। যেমন ইংরেজিতে উই শব্দ দিয়ে যা বোঝানো হয়, অনেক ভাষায় সে রকম অর্থ নির্দেশের জন্য উই এর মতো একক শব্দ নেই; তার জন্যে ওসব ভাষায় আরো অনেক ধরনের শব্দ প্রয়োজন হয়। এ থেকে বোঝা যায়, উই শুধুমাত্র একটা রূপমূল মাত্র নয়, বিশেষ ধরনের শ্রেণিকরণও- যে শ্রেণিকরণ অন্যান্য ভাষায় যেখানে অমন শব্দ নেই তার শ্রেণিকরণ থেকে ভিন্ন (পৃ. ৭৮)।

ভাষা সামাজিকীকরণে শব্দের প্রয়োগে নিম্নলিখিত বিষয় সংশ্লিষ্ট-

১০.১ জ্ঞানমূলক *শ্রেণিকরণ (cognitive categories):* কোনো সংস্কৃতির মানুষ কীভাবে চিন্তা করে বা কীভাবে জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে তা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংগঠন দেখলে উপলব্ধি করা যায়। এ জ্ঞান তারা আয়ত্ত করে প্রথাগত বিশ্বাস, ধারণা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, আদর্শ তথা সংস্কৃতি থেকে। ইয়াগুয়া ভাষায় animate বলতে প্রাণ আছে এমন বস্তুকেই বোঝায়। তাই তাদের ভাষায় এটি বলতে জীবন আছে না বুঝিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বকে বোঝায় (Yule, 2010:271)।

১০.২ *নির্দেশক (classifiers):* নির্দেশকের ব্যবহার ভাষায় সংস্কৃতি ভেদে পার্থক্য হয়ে থাকে। এটি দ্বারা সাধারণত সংখ্যা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ভাষায় তা বস্তুর বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করে। যেমন-জাপানি ভাষায় লম্বা পাতলা কোনো জিনিস বোঝাতে ব্যবহৃত হয় hon; কিন্তু মোটা পাতলা জিনিস বোঝাতে mai ব্যবহৃত হয় এবং ছোটো গোল জিনিস বোঝাতে ব্যবহৃত হয় (Yule, 2010: 272)।

১০.৩ *সামাজিক সংবর্গ (social categories):* যেসব শব্দের সাহায্যে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় বা সংজ্ঞাপন হয় তাকে বলা যেতে পারে সামাজিক

শ্রেণিকরণ বাচক শব্দ। যেমন- চাচা, নানা, ভাই প্রভৃতি। আমরা অনেক সময় আমাদের পরিবারের কেউ নন কিন্তু তাকে সম্বোধন করার জন্য চাচা, ভাই, বোন, ভাবি প্রভৃতি অভিধায় ডেকে থাকি। সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে এসব শব্দের ব্যবহারের ভিন্নতা রয়েছে। এসব শব্দের সাহায্যে আবার সহজেই সমাজকে শ্রেণিকরণ করা সম্ভব হয়। তবে এ সম্পর্কিত আলোচনার সীমাবদ্ধতাও লক্ষণীয়-

> The final problems with current research on the consequences of biased language use is the inattention to social context. The social identity approach, compressed of social identity theory and self-categorization theory (A. and Clement, 2015;182).

১০.৪ জ্ঞাতিগোষ্ঠী *সংক্রান্ত অভিধা (Kinship terms):* সব ভাষাতেই জ্ঞাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত শব্দ রয়েছে; যেমন- বাবা, মা, খালা, ফুফু, ভাই, বোন প্রভৃতি। এসব জ্ঞাতিগোষ্ঠী নির্দেশক শব্দ সব ভাষাতেই একই অর্থে প্রয়োগ হয় না। সংস্কৃতিভেদে এর পার্থক্য দেখা যায়। বাংলাসহ কোনো কোনো ভাষায় পিতা বলতে পুরুষ পিতাকে বোঝায় কিন্তু কোনো কোনো ভাষায় তা পিতার ভাইকেও নির্দেশে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যেমন, ব্রাজিলের মোপান মায়ার আদিবাসীদের ভাষায় uncle অর্থ নিম্নরূপ-

> Suku'un: Older brother and parent's younger brother
> Tataa: parnt's older brother and grandfather

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে সহজেই প্রতিভাত যে, মপান মায়ান সংস্কৃতিতে আংকেলের বয়সের পার্থক্যের কারণে অর্থভিন্নতা ঘটে। নয়ওয়েজীয় ভাষায় পিতার মাকে বলা হয় farmor এবং মাতার মাকে বলা হয় mormor। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় grandmother (Yule, 2010)। বাংলা সংস্কৃতিতেও এই পার্থক্য সহজেই অনুমেয়; পিতার মাতাকে বলা হয় দাদী এবং মাতার মাতা অভিহিত নানী বলে। সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে জ্ঞাতি সংক্রান্ত শব্দেরও পার্থক্য ঘটে।

১০.৫ *সময় ধারণার সাহায্যে:* সময় ধারণার সঙ্গে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ ও মাস ও বছরের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন; আমরা বলি এক ঘণ্টা, দুই দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস প্রভৃতি। আরিজোয়ানার হোপি ভাষার সংস্কৃতিতে এ ধরনের কোনো শব্দ বা শব্দাংশ নেই। কারণ আমারদের সংস্কৃতিতে ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট

সময় থাকলেও হোপি সংস্কৃতিতে তা নেই। তাদের ভাষায় সাতদিনের অস্তিত্ব যেমন নেই তেমনি নেই বুধবার বা শুক্রবারের নাম (Yule, 2010)।

১০.৬ *সম্বোধনবাচক শব্দ (address terms):* প্রত্যেক সংস্কৃতিতে সম্বোধন প্রকাশের ভাষা রয়েছে। সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে এর পার্থক্য হয়ে থাকে।

১০.৭ *লিঙ্গ (Gender)*: লিঙ্গ সাধারণত দুইভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে-জৈবিকভাবে (Physically) এবং ব্যাকরণিকভাবে (Grammatically)। অনেক ভাষায় নারী ও পুরুষ বোঝাতে এই লিঙ্গ অভিধা প্রয়োগ হয়ে থাকে। কোনো ভাষায় লিঙ্গ কেবল জৈবিক দিকটিই নির্দেশ করে, অন্যত্র আবার এর মাধ্যমেই ব্যাকরণিক দিক প্রকাশিত হয়। যেমন, জার্মান, ফরাসি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় লিঙ্গ ব্যাকরণিক; অন্যদিকে বাংলা, ইংরেজি তথা অন্যান্য ভাষায় লিঙ্গ জৈবিক। লিঙ্গের সাহায্যে আবার ব্যক্তির সংস্কৃতিও প্রকাশ পায়। যেমন, নারীদের ভাষার শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে পুরুষের ভাষার শব্দভাণ্ডারের পার্থক্য ঘটে। ভাষার অন্যান্য স্তরেও এরূপ বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ লিঙ্গের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ভাষার সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাবও লিঙ্গের সাহায্যে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১১. গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল

আলোচ্য গবেষণায় শব্দ ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিরূপণপূর্বক এ দ্বিবিধ বিষয়ের আলোচনার প্রয়াস রয়েছে। শব্দ, ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য নির্মাণে উদিষ্ট সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করা জরুরি। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয় গুরুত্ব দেওয়া অতীব জরুরি-

১. ভাষার শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অভিযোজন অত্যাবশ্যক।

২. ভাষার অন্যান্য উপাদানের ন্যায় শব্দ অনুমেয় নয়। এটি অনেক ক্ষেত্রেই অননুমেয়।

৩. 'বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ শব্দের অবস্থান নিশ্চিত করার মত কোনো ব্যাকরণিক সূত্র নেই; ভাষার শব্দকোষ বা আভিধানিক কক্ষটি সম্পূর্ণই স্বায়ত্তশাসিত ও নিয়ম-নিরপেক্ষ (গফুর, ১৯৯৪: ১৩৯)।

৪. 'বর্তমানে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় এখন বেশ স্পষ্ট। একটি হচ্ছে সাধারণভাবে জনমানুষের মুখের ভাষার রক্ষণশীলতা, আর অন্যটি হচ্ছে লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্কৃতায়নের পথে নবযাত্রা করার

প্রবণতা। উভয়ের টানাপোড়েনে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষার শব্দাবলি ও তাদের উচ্চারণগত রূপ কীভাবে বিবর্তিত হবে তা অনুমান করা দুরূহ (গফুর, ১৯৯৪: ১৫০)।

৫. বাংলা শব্দভাণ্ডারে দেশি শব্দের তুলনায় বিদেশি শব্দের প্রাধ্যান্য বেশি। এর অন্যতম কারণ হলো ধর্মীয়, রাজনৈতিক, তথ্যপ্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক।

১২. উপসংহার

শব্দ ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর যথার্থ প্রয়োগেই অনেকাংশে ভাষার যথার্থ প্রয়োগ নির্ধারিত হয়। ভাষার এই উপাদানের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগের বহুবিধ ক্ষেত্র রয়েছে। এসব ক্ষেত্র অনুসরণের মধ্য দিয়েই শব্দের যথাযথ ব্যবহার লক্ষণীয়। সাংস্কৃতিক আবহে ব্যবহৃত শব্দের স্বরূপ জানতে হলে তাই সংস্কৃতিতে কীভাবে শব্দের ব্যবহারের ভিন্নতা ঘটে তা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিহাসও সংশ্লিষ্ট। এ প্রপঞ্চ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাই এরূপ ইতিহাস বর্ণনা ও উল্লেখের আবশ্যকতা উপেক্ষণীয় নয়। সংস্কৃতি ভেদে শব্দের ব্যবহারের ভিন্নতা অন্বেষণের মাধ্যমে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ ক্ষেত্র নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাই কখন, কোথায়, কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়।

তথ্য-নির্দেশ

খান, ফরহাদ। (২০১২)। *বাংলা শব্দের উৎস-অভিধান*। ঢাকা: অবসর।

গফুর, শামসুর নাহার। (১৯৯৪)। *বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা*। মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা* (১৩৯-১৫১)। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

চৌধুরী, কামাল আবদুল নাসের। (২০১৮)। *বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা*। ঢাকা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। কলিকাতা: নয়া উদ্যোগ।

মুসা, মনসুর ও ইলিয়াস মনোয়ারা। (১৯৯৪)। বাঙলায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দ। মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা* (২২৫-২৩৮)। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

রশিদ, মোহাম্মদ হারুন। (২০২০)। *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশি শব্দের অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

লেখা, ইয়াসমীন আরা। (২০১৪)। *ফরিদপুরের সমাজ-উপভাষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সরকার, তপতী রানী। (২০১৩)। *বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হুমায়ুন, আজাদ। (১৯৯৮)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব চর্চা পরিষদ।

Katherine A. and Richard Clement. (2015). Word We Use: Linguistic Bias and Prejudice. Rene Torres Cacoullos, Nathalie Dion, and Andre Lapierrre (eds), *Linguistic Varriation Confirming Fact and Theory*, (178-192).

Baker, Mona. (1992). *In Other Words: A Course Book on Translation*. England: Clays Ltd, St Ives.

Danesi, M. (2004). *A Basic course in anthropological linguistics*. Toronto: Canadian Scholoars press Inc.

Dixon, R. M. W and Aikhenvald. (2007). *Word A Cross-linguistic typology.* Cambridge University Press.

Hudson, Richard. (2007c). *Language Networks: the new Word Grammar. English Language and Linguistics*. Oxford University Press.

Nettle, Daniel and Romaine, Suzanne. (2017). Why Something should be done. Stephen May (ed), *Language Rights* (83-109). Routledge.

PLC. Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation. London:* Oxford University Press.

Hornby, A. S. (1995). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current* English. Oxford University press.

Meyer, Stephenie. (2005). *Twilight.* New York: Little Brown and Company.

Lily Devita Sari (Trans, 2008). Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Swadesh, M. (1951). Diffutional cumulation and archaic residue as Historical expantations. *Southwestern Journal of Anthropology* 7, (1-21).

Utama and Newmark, Peter. 1988. *A Textbook of Translation. London*: Prentice Hall International.

বাংলা ফন্টের উন্নয়নে প্রযুক্তির যোজনা

খান মাহবুব *

Abstract: The continuous development of Bangla fonts is essential for promoting Bangla language globally. Fonts of every language reflect a part of its land, people, and nature associated with its region. Bangla fonts are no exception. However, the activities aimed at developing Bangla fonts have not been consistent over time. The potential and attraction of fonts have greatly increased, whether on paper or digital displays, to satisfy the linguistic needs of Bangla-speaking individuals and to encourage more creative font usage.

This paper, titled "The Role of Technology in the Development of Bangla Fonts," thoroughly states the key aspects that need to be prioritized for the betterment of Bangla fonts. It also puts importance to ensure multilingual compatibility in Bangla keyboard system on computers. The evolution of fonts over the thousand-year history of the Bangla language, along with the evolution of technology in font development, has been critically analyzed in this paper.

This paper falls under the category of review-based research. Information and data have been collected from various writings, newspapers, websites, and books, adhering to proper referencing methods.

মূলশব্দ (Keywords): বাংলা ফন্ট, ফন্ট ডেভেলপমেন্ট, বাংলা টাইপফেজ, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট।

* Khan Mahbub, Adjunct Faculty, Department of Printing and Publication Studies, University of Dhaka.

ডিজিটাল পরিসর যখন আধুনিক বিশ্বের মহাযজ্ঞ, তথ্য প্রযুক্তি তখন হাতিয়ার। ডিজিটাল পরিসরে বাংলা ভাষার ব্যবহার এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হলেও পথচলা এখনো অনেকটা বাকি। অন্যান্য ভাষায় যে কাজগুলো ইতোমধ্যেই করা হয়ে গেছে, যার জন্য তারা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছে খুব সহজেই, বাংলা ভাষায় সেই কাজগুলো এখনো করা হয়নি বিধায় ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি আর শৈল্পিক যোগসূত্রতা তৈরি হতে পারেনি। প্রাত্যহিক জীবনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন ডিজিটাল মাধ্যম অপরিহার্য। ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী সবকিছুই এখন অনস্ক্রিনভিত্তিক ফরম্যাট অনুসরণ করছে। ব্যবহারকারীর অনস্ক্রিন অভিজ্ঞতাকে আরো মসৃণ করতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পাঠযোগ্যতা আর কনটেন্ট প্রবেশযোগ্যতার উপর। ডেস্কটপ থেকে স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবহারকারীর পাঠযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে সমস্যা যেমন রয়েছে, সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলা ভাষাকে ডিজিটাইজড করতে আমরা অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। এর মূল কারণ ডিজিটালকরণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিই এখনো যথাযথরূপে তৈরি হতে পারেনি।

বাংলা ভাষা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিক সময়ে এই বিষয়ে কাজ করা শুরু করেছে। আশির দশক থেকে দেশে কম্পিউটার চালু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার ডিজিটাইজেশনে সবচেয়ে বড়ো বাধা হলো ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষার কম্প্যাটিবিলিটি। বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা ভাষার কম্প্যাটিবিলিটি বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও আমরা পিছিয়ে আছি। সেই তুলনায় বাংলা ভাষার চেয়েও জটিল ভাষাগুলো ডিজিটাল মাধ্যমে এই কম্প্যাটিবিলিটি অর্জনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কারিগরি দিক থেকে বাংলা ফন্টের ডেভেলপমেন্টে জটিলতার পাশাপাশি ফন্টের নান্দনিকতা এবং প্রাচুর্যের দিক থেকেও ঘাটতি রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবেশী দেশের 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সফলতা উল্লেখযোগ্য। বাংলা ফন্টের নান্দনিকতা এবং প্রতুলতার দিক বিবেচনায় ব্যক্তি উদ্যোগই বেশি প্রশংসনীয়। ইদানীং সরকারের মন্ত্রণালয়ও এই বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছে। বিশেষ করে স্যুজিৎ রায়, কাইয়ুম চৌধুরী সংবিধানে ব্যবহৃত অক্ষর শিল্পের মতো টাইপোগ্রাফি, বাংলা পুথির লেখা থেকে বাংলা ফন্টে রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলা ডিজাইন ফন্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত ফন্টের তুলনায় ডিজাইন ফন্টের অপ্রতুলতা কিছুটা হলেও দূর হয়েছে।

লিপিঘরের মতো ব্যক্তি উদ্যোগে গঠিত প্রতিষ্ঠানও বাংলা ফন্ট ডেভেলপমেন্টে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ২২১টি বাংলা ফন্ট ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত করেছে। চতুর্থ বিপ্লবের জোয়ারে ফন্ট ডেভেলপমেন্টও কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে। এক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বড়ো ভূমিকা পালন করবে। এনএলপি (ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং) নির্ভর করে এআইয়ের উপর। এর সাথে আছে মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা অ্যানলিসিসের সংযুক্ততা। এসব কিছুর সাথে বাংলা ভাষার সংযুক্ততা নিঃসন্দেহে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তবে ব্যক্তিগণ উদ্যোগ বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বা শিল্পোদ্যোগে এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব।

মহান একুশের অর্জন ও ভাষার সীমানা এখন ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলে থিতু নয়, এটি এখন বিশ্বময়। ফলে মাতৃভাষার চর্চা এখন আবেগ ও মমত্বের বিষয় নয় কেবল, বরং অনেক বেশি দায়িত্বেরও। এ প্রসঙ্গে সেই পুরনো কথার নতুন উপলব্ধি- 'বিশ্বমানব হবি যদি কায়মনে বাঙালি হ'। এজন্য ভাষার বড়ো ক্যানভাসে চিন্তার জমিনের নানান যোজনায় বাংলা ফন্টের উন্নয়ন একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়। প্রতিটি ভাষায় ব্যবহৃত ফন্টের চরিত্রে সেই অঞ্চলের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির একটা মিশেল থাকে। বাংলা ফন্টও এ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু বাংলা ফন্টের উন্নয়নে কালিক বিচারে কার্যক্রমগুলো নিরবচ্ছিন্ন ও সমন্বয়ী নয়। ফলে ফন্টের লেখাঙ্কনের (ক্যালিগ্রাফি) আনুষ্ঠানিক চর্চা অপ্রতুল। বর্তমান ভার্চুয়াল প্রজন্ম বলপয়েন্ট দিয়ে লেখার হাতেখড়ি একই সাথে কম্পিউটারে কী-বোর্ড তাদের বেড়ে ওঠার সঙ্গী-সেই কালপর্বে হাতে লেখার প্রয়োজন কি ফুরাচ্ছে? তবে বাস্তবতা হচ্ছে কাগজের জমিন হোক কিংবা কম্পিউটারের মনিটর হোক, ফন্টের পরিধি ও আবেদন বেড়েছে। অবধারিতভাবে এখন ফন্ট উন্নয়নে প্রযুক্তি সংযুক্ততা আবশ্যক।

একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা টাইপফেজ তৈরি করতে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, আ-কার, ই-কার, যুক্তবর্ণসহ প্রায় সাড়ে চারশ ক্যারেক্টার প্রয়োজন (হাজরা, ২০২৪)। একথা ফন্টের উন্নয়নে কাজ করা সকলের কাছে অবশ্যমান্য। বাংলা টাইপফেসের ব্যবহার এত বিচিত্র যে, তুলনামূলক অপ্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পরীক্ষার জন্য বেশ খানিকটা সময় প্রয়োজন। সাবেকীকালের শ্রী নৃত্যলাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত *শিশুবোধক*, রামসুন্দর বসাক প্রণীত *আদি বাল্যশিক্ষা* (১৮৭৭), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বর্ণ পরিচয়* (১৮৫৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সহজ পাঠ* (২৩৩৭ বঙ্গাব্দ), মদনমোহন তর্কালঙ্কার *শিশু শিক্ষা* (১৮৪৯), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *চিত্রাক্ষর* (১৯২৯) এমনকি আদিপর্বে *Nathaniel Brassey Halhed* প্রণীত *A*

Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮) বইয়ে ফন্টের প্রকারভেদ মাথায় নিয়ে বাংলা ফন্টের উন্নয়নে প্রযুক্তি ও পদ্ধতি কোনটি লাগসই হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। বাংলা ভাষা ও বর্ণে আদিসূত্রে নাগরীলিপি, আরবির প্রভাব রয়েছে। বাংলা ফন্টের উন্নয়নে এসব পূর্বসূত্র বিবেচনায় রাখতে হবে।

বাংলা ফন্টের উন্নয়নে যদি ইতিহাসের খেরোখাতায় চোখ রাখি তবে বেশ কিছু বিষয় কালের ধুলো সরিয়ে আমাদের ইতিহাসের পাঠ নবায়ন করে হাজির করে। ১৭৭৮ সালে চার্লস উইলকিনস বাংলা ফন্টের প্রথম জটিল ছেনিকাটা ফিক্সড ফন্ট তথা বিচল অক্ষর তৈরির কৌশল লন্ডন থেকে আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে উইলকিনসের সহায়তায় দেশীয় উপযোগিতায় বাংলা ফন্টের উন্নয়ন ও সরলীকরণ ঘটান পঞ্চানন কর্মকার। এ পথকে প্রশস্ত করেন তদীয় পুত্র মনোহর কর্মকার। পান, শামুক, ত্রিভুজ, চক্রের সমাহার এসবের বিন্যাসে বাংলা হরফ এগিয়েছে। তবে বাংলা ফন্টের বর্তমান রূপে আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে (চক্রবর্তী, ২০২০: ১৫)।

ফন্টের ছেনিকাটা যুগের ইতি টেনে আমরা ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছি ১৯৯৬ সালে 'শহিদলিপি সফটওয়্যার' ব্যবহার করে। বাংলা ফন্টের উন্নয়নে আইসিটি মন্ত্রণালয় বেশকিছু কাজ করছে। বাংলা ডিজাইন ফন্টের নানামাত্রিক দিকের মধ্যে আইসিটি বিভাগ 'কমিকস'-এর ফন্টের শৈলী ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য বেশি কাজ করছে। টেক্সের জন্য "পূর্ণ" নামের ফন্ট তৈরি করেছে। যার মধ্যে সবগুলো গিভ বা বর্ণ আছে। বাংলা ফন্টের একটা বড়ো সমস্যা ভিন্ন প্লাটফর্মে ভেঙে যাওয়ার সমস্যা। আশা করা হচ্ছে "পূর্ণ" ফন্ট এ সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। এ বিষয়ে আরেকটা তথ্য বলে রাখি ছোটোদের জন্য এনসিটিবি "স্বচ্ছ" নামে একটি ফন্ট তৈরি করেছে। এই ফন্ট সহজ। যেমন– রূপায়ণ লিখতে পাশে '়' বা নিচে দেয়া যাবে। ছোটোরা যাতে সহজভাবে বুঝতে পারে, দেখতে পারে। এখন এ বিষয়ে একটি সার্বিক যোজনা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে বাংলা হরফ নানা কায়দায় ভাঙাচোরা যায়। আর যত ভাঙবে ততই নানা রকমের গড়ন বেরিয়ে আসবে এর থেকে। ফন্টের উন্নয়নের পথে হাঁটতে মনে রাখতে হবে টাইপ জটিলতা, টাইপিং সফটওয়ারের অভাব, টেক্সট টু স্পিচ এবং স্পিচ টু টেক্সস, স্বয়ংক্রিয় চ্যাট বট, ভার্চুয়াল সহকারী ইত্যাদি সমস্যা আছে। পরিতাপের বিষয়, কোনো দোহাই না টেনেই বলা যায় এক্ষেত্রে অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত নয়। অগ্রগামী পৃথিবীতে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে আমাদের ফন্টের উন্নয়ন সমার্থক। বহুরৈখিক পরিকল্পনের সাথে ফন্টের সাধারণ সুবিধাগুলোকে

বিবেচনায় রাখতে হবে, যেমন– সুস্পষ্ট মুদ্রাক্ষর, বর্ণাকৃতির সহজপাঠ্যতা, স্পেস বা ব্যবধান ইত্যাদি। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে ডোমেইনে বাংলা ভাষার ব্যবহার, গুগল বিজ্ঞাপনে বাংলা অনুমোদন, ই-কমার্সে বাংলার ব্যবহার, ডিজিটাল অভিধান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাগ্রসর পরিকল্পনা গ্রহণে বাংলা ফন্টের উন্নয়ন ঘটবে। আলোচনায় আবার যদি পিছনে তাকাই, তবে দেখতে পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত *বর্ণ পরিচয়* গ্রন্থ দুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। প্রথম ভাগ: অসংযুক্ত বর্ণ, দ্বিতীয় ভাগ: সংযুক্ত বর্ণ (বিদ্যাসাগর, ২০১৬)।

মজার বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেহনাশের পাঁচ বছর পরে (১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে) তাঁর সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন বর্ণ পরিচয়ের সংস্কার করেন। এতে শুধু বর্ণ ও শব্দের সরলীকরণ নয় ফন্টের আধুনিকায়নের নজর মিলে। অর্থাৎ বাংলা ফন্টের উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। উল্লেখ্য নারায়ণচন্দ্র প্রথমত তাঁর পিতৃদেব রচিত বর্ণ পরিচয় থেকে অপ্রচলিত তৎসম শব্দগুলিকে যথাসম্ভব বর্জন করে প্রচলিত শব্দের সংযোগ ঘটান। দ্বিতীয়ত, তিনি বর্ণমালা শিক্ষায় শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য (প্রথমভাগে) প্রতিটি বর্ণের জন্য একখানি চিত্র সংযোগ করেছিলেন (বিদ্যাসাগর, ১৯৮৪)। বাংলা টাইপোগ্রাফারকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বর্ণমালা ও লিপি কৌশলে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। বাংলা ফন্টের ছাপার যুগ শুরু হবার পর অক্ষরের আকৃতি সুনির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া জরুরি হয়ে পড়ে। বাংলার আধুনিক টাইপোগ্রাফ বা লিপি কৌশলের শুরু সেখান থেকেই। বাংলা বর্ণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটা ধ্বনিমাত্রিক ও অক্ষরমাত্রিকের একটা মেলবন্ধন রয়েছে। অনেকে সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষর সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বাংলা লিপিকে পুরোপুরি অক্ষরমাত্রিক করার পক্ষে। যদিও এটা বাস্তবসম্মত নয়। তবে করা গেলে ফন্টের ব্যবহার ও উন্নয়ন সহজ হতো।

বাংলা বর্ণমালার আকৃতির ব্যবচ্ছেদ করা গেলে দৃশ্যমান রকম ভেদ নিম্নরূপ (কোরেশী, ১৯৯০: ২০)

আকৃতির ধরণ	বর্ণ
বৃত্ত	০, ত, অ, ভ, ও, ড ইত্যাদি
ত্রিভুজ	ব, ক, র, ধ, ঝ ইত্যাদি
বহুভুজ	য, য়, ফ, খ, ম, স ইত্যাদি
বড়শী	ঢ, ট, দ, চ ইত্যাদি
সরীসৃপ	১, ২, ৎ, ৯ ইত্যাদি

বাংলা লিপির টাইপ রাইটার থেকে কম্পিউটারে ব্যবহারে কিছু সমস্যার পুরোপুরি মিটমাট করা যায়নি। এজন্য মুনীর অপটিমা কি বোর্ডে কিছু বর্ণ বাদ রাখা হয়েছিল। ফন্টের উন্নয়নে এসব বিষয় মাথায় রাখতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কম্পিউটারে বাংলা ফন্টের বিভিন্ন ডিজাইন পরিবর্তনে ভাঙ্গনে এখন ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহৃত হলেও এই ফন্টে মুদ্রণ শৈলীর জন্য কাম্য মানের নয়। এসব বিষয় মাথায় রেখেই সার্বিক উন্নয়নের কাজ করতে হচ্ছে। ফন্ট হলো কোনো লিপিতে ব্যবহৃত সমস্ত রকম বর্ণের একটি সাদৃশ্যমূলক সম্পূর্ণ সমষ্টি। বাংলা ফন্টের বড়ো সমস্যা যুক্তাক্ষর। বাংলা টাইপফেস (মুদ্রণশৈলীর পরিভাষায় টাইপফেসকে বলা হয় মুদ্রাক্ষর-ছাঁদ। এটি কতগুলো হরফের সমষ্টিকে নির্দেশ করে যা শৈলীগতভাবে একইরকম। একটি মুদ্রাক্ষর-ছাঁদে কোনো ভাষার বর্ণমালা, অঙ্ক, বিরামচিহ্ন, প্রতীক প্রভৃতি থাকতে পারে) ডিজাইনে এই যুক্তাক্ষর তৈরিই সবচাইতে শ্রমসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ কাজ। মূল বর্ণমালা যুক্তাক্ষরের পরে তৈরি করতে হয় বিভিন্ন কার, বিভিন্ন ফলা ও সংখ্যা।

বাংলা টাইপফেস ডিজাইন করতে যে হরফ ও অন্য নিয়ামক প্রয়োজন হয় (২০২৩)-

১. মূল বর্ণমালা (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ)
২. যুক্তাক্ষরসমূহ
৩. কার, ফলা, সংখ্যা
৪. যতিচিহ্ন ও অতিরিক্ত চিহ্নসমূহ ।

অথচ ইংরেজি টাইপফেস ডিজাইনে বর্ণমালা ছাড়া বিশেষ কিছুর প্রয়োজন নেই। বাংলা ফন্টের সমস্যাকে সরলীকরণ করে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে সর্বজনীন ব্যবহারে প্রযুক্তিবিদরা তৎপর। উন্নয়নের ছুরি-কাঁচি চালানো হচ্ছে কিন্তু এখনও কাম্যমানে পৌঁছানোতে যোজন দূরে আছি আমরা। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২০২৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) নিজেদের ইউএন বাংলা ফন্টের ইউনিকোড সংস্করণ প্রকাশ করেছে। ইন্টারনেটে বাংলা ব্যবহারে বৈচিত্র্য আনতে প্রকাশিত 'ইউএন বাংলা' ফন্টের ইউনিকোড সংস্করণ বাংলাদেশের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডও করা যাচ্ছে (সিদ্দিক, ২০২৩)। এতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার ব্যবহার সহজ এবং প্রবেশগম্যতা বাড়াতে নতুন ফন্ট প্রকাশের এই উদ্যোগ

ফলদায়ী। ইউএন বাংলা ফন্টের নকশাকার মুহিবুর রহমান রাজন বলেন, 'আসলে আমাদের প্রিয় বাংলা বর্ণমালায় যুক্তাক্ষরসহ সব মিলিয়ে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তাই বাংলা বর্ণমালা নিয়ে কাজ করার সুযোগটাও বেশি (জাতিসংঘ বাংলাদেশ অফিস প্রেস রিলিজ, ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।' রাজন আশাবাদী ও কর্মপ্রিয় মানুষ বলে সম্ভাবনার কথা বলেছেন কিন্তু যুক্তবর্ণ ও নানা বৈচিত্র্যের বাংলা টাইপফেজের জটিলতা মান্য করে ফন্ট ডেভেলপমেন্টের পথটা কতটা বন্ধুর তা তিনি ভালো জানেন। বাংলা ফন্টের একই সাথে সুবিধা ও অসুবিধা হলো বাংলা হরফ নানা কায়দায় ভাঙাচোরা করা যায়। আর যত ভাঙা যায় ততই গড়ন বেরিয়ে আসবে এর থেকে। ফন্টের উন্নয়নের পথে হাঁটতে টাইপ জটিলতা, টাইপিং সফটওয়ারের অভাব, টেক্সট টু স্পিচ এবং স্পিচ টু টেক্সট, স্বয়ংক্রিয় চ্যাট বট, ভার্চুয়াল সহকারী ইত্যাদি সমস্যার উত্তরণ আবশ্যক। ইতোমধ্যে আনন্দের খবর দিচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষাকে অভিযোজিত করার লক্ষ্যে 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা ফন্টকে স্পেলচেকার, সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, বাংলা ভয়েস টু টেক্সট, বাংলা ন্যাশনাল করপাস, বাংলা ভার্চুয়াল অ্যাসিসটেন্ট, সার্চ ইঞ্জিন সমুদ্র, স্ক্রিন রিডার, বাংলা সাইন ল্যাংগুয়েজ রিকগনিশন সিস্টেম ইত্যাদি শিরোনামে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ফন্টের বাংলা ওসিআর সার্ভিস যে কোনো ফন্টে থাকা বাংলা লেখাকে পিডিএফ বা ছবিতে থাকা বাংলা লেখাকে সার্চেবল বা এডিটেবল লেখায় রূপান্তর করা যাবে এবং রূপান্তরিত লেখা কম্পোজকৃত লেখার অনুরূপ এডিটেবল টেক্সটে রূপান্তর করা যাচ্ছে। এছাড়া বাংলা ফন্ট কনভার্টার কার্যক্রমের আওতায় পুরনো সব বাংলা এনকোডিং সিস্টেমকে ইউনিকোডে রূপান্তর করা যায়। বাংলা ফন্ট ইন্টারোপারোবিলিটি ইঞ্জিন রূপান্তর বাংলা ফন্ট এবং এনকোডিং সিস্টেম রূপান্তর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি 'ফন্ট ইন্টার-অপারেবিলিটি ইঞ্জিন' (Font Interoperability Engine) বাংলা ভাষাকে ডিজিটালাইজ করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পুরোনো সাবেকি (ASCII) বাংলা টেক্সটকে ইউনিকোড (Unicode) বাংলা টেক্সটে রূপান্তরের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

বাংলা ফন্টে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার একটি সুনির্দিষ্ট রীতির দাবি করে। কিন্তু যুক্তাক্ষরে বর্ণের আকৃতি বদলের ফলে কতক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন বর্ণ আমদানি

করার যথেচ্ছাচার সমর্থন করা যায় না। যুক্তাক্ষরকে এমনভাবে গঠন করা দরকার যেন মূল অক্ষরগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। কাউকে নতুনভাবে শিখতে না হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ও মদন মোহনের চিন্তা ও কাল থেকে আমাদের নবায়ন প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের দাবিতে আকৃতিগত পরিবর্তন না করেও আমরা সব রকমের যুক্তাক্ষর গঠন করতে পারি। 'ক্র' না হয়ে '' হলে দোষের কিছু নেই। এতে ফন্টের অচেনা রূপ দেখা দিবে না। ফন্ট নিয়ে কাজ করা অনেকের দাবি শুধু বর্ণ ও চিহ্ন বাহুল্যই বাংলা ভাষার প্রসার ও প্রচলনে বাধা এমন বিষয়টি আমলে নেয়া প্রয়োজন। বাংলা লিপির বিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া। হ্যালহেডের ব্যাকরণ হতে মদন মোহন ও বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় হতে অনেকের ফন্টের বিচিত্র রূপসহ বর্তমানে সব্যসাচী হাজরার করা ফন্ট উন্নয়নের পরিচয় পরিস্ফুট হয়।

বাংলার অতীতের শাসকরা দূর-দূরান্ত হতে এসে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মিশেল গড়েছে এ মাটিতে। আরবি-ফার্সি ভাষা ও ক্যালিওগ্রাফ আজও সে সাক্ষ্য দেয়। আমাদের বাংলা ফন্টের যাত্রাপথে সেসব ভাষার বর্ণের প্রলেপ মাখেনি এ কথা দিব্যি কেটে বলা যাবে না। প্রসঙ্গত চারুলিপিকারেরা আরবি লিখতে সুলতানি শাসন আমলে এ অঞ্চলের জীবন প্রকৃতি যেভাবে তুলে এনেছেন বাংলা লিপিতে কি ততটা হয়েছে! আরবি শৈল্পিক রীতির মধ্যে বহুত্বের মাঝে একত্বের এক অনবদ্য নিদর্শন। যা বাংলা লিপির ক্ষেত্রে স্বরূপ ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে চিন্তার গভীরে রাখা প্রয়োজন (খান, ২০২৪)। বাংলা ফন্ট ভাবনায় বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশপর্বও মাথায় রাখতে হবে। বাংলা ভাষার হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় আদি, আদিমধ্য, অন্ত্যমধ্য ও আধুনিক যুগে বিভাজিত। অর্থাৎ কালপ্রবাহে ফন্টের বিবর্তনও ঘটেছে। বঙ্গকামরূপী অপভ্রংশ রূপ থেকে বাংলা, অহমিয়া, উড়িয়া ভাষা তৈরি হয়েছে বলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র দাবি। এজন্য উল্লিখিত তিনটি ভাষার ফন্টের স্বাতন্ত্র্য রূপ থাকলেও কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। সঙ্গত কারণে বাংলা ফন্টের উন্নয়নের বড়ো ক্যানভাসে সেই বিষয়গুলোর সংশ্লেষের আবশ্যিকতা বিদ্যমান (ঘোষ, ২০২৩)। বাংলা ফন্টের প্রযুক্তিগণ উৎকর্ষের পদক্ষেপে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে–

- ফন্টের ব্যবহার উপযোগিতা বাড়িয়ে ভিন্ন প্লাটফর্মে ব্যবহার নিশ্চিত করা
- অক্ষর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করা
- যুক্তাক্ষরে মূল অক্ষরের আকৃতি বদল সম্পূর্ণ পরিহার করা
- ফন্ট কাঠামো লিনিয়ার বা সরল রৈখিক হতে হবে

- নিচের দিকে চিহ্নের ব্যবহার কমিয়ে পাশে অর্থাৎ ডানে-বামে সংযুক্তির ব্যবস্থা করা
- টাইপোগ্রাফি ও ফন্ট ডিজাইন সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) সাধন
- যুক্তাক্ষরের অবয়ব সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে লিপির অনাবশ্যক জটিলতা দূর করতে হবে
- ফন্টের কাঠামোতে সরলীরূপ ও সবক্ষেত্রে বিশেষত যুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে ফন্টের ধরন পরিবর্তন পরিহার করতে হবে
- ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহারে ফন্টের ভেঙে যাওয়া নিবারণ ও সকল প্লাটফর্মে সহজ একসেস নিশ্চিত করা
- প্রযুক্তিবিদ ও ভাষাবিদদের সমন্বয়ে মুদ্রিত ও ডিজিটাল প্লাটফর্মে যুগপৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা
- লিপির সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের স্বীকৃতি এবং সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে একটি সার্বিক Code of Conduct তৈরি করতে হবে
- সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে ডোমেইনে বাংলা ভাষার ব্যবহার গুগল বিজ্ঞাপনে বাংলা অনুমোদন ই-কমার্সে বাংলা ব্যবহারে ডিজিটাল অভিধান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাগ্রসর পরিকল্পনা প্রয়োজন
- এছাড়া সুস্পষ্ট মুদ্রাক্ষর, বর্ণাকৃতির সহজ পাঠ্যতা, স্পেস বা ব্যবধান ইত্যাদি সাধারণ বিষয়গুলোতে অবশ্যই চিন্তায় যুক্ত রাখতে হবে।

ফন্টের উন্নয়নে ছোটোখাটো বিষয়ে চিন্তার রশ্মি ফেলতে হবে। যেমন ক্যালিওগ্রাফি ও লেটারিং যে ভিন্ন। দুটোর মধ্যে সাযুজ্য থাকলেও অক্ষরের ক্যালিওগ্রাফিক টাইপ বর্ণানামূলক লেখার জন্য পুরোপুরি উপযোগী। এটা সৃষ্টির সময় সুন্দর লেটারিং এর মাধ্যমে ফন্টকে নান্দনিক করা হয় (সরকার, ২০২০)। এটাকে ক্যালিওগ্রাফি বলা ঠিক নয়। এমন অনেক ভেদ-বিভাজন রয়েছে। আরেকটি বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রকাশ (Expression)। এক্ষেত্রে সুন্দর প্রকাশে অনেক বিষয়ের সাথে ফন্টের গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

বাংলা ফন্টের উন্নয়নে মোটাদাগে সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনির বিষয় ফন্টের রূপ প্রকরণ ও বিবর্তনের চালচিত্র মাথায় রাখা জরুরি। কম্পিউটার বাংলা কি-বোর্ডে মাল্টিলিঙ্গুয়েল কম্প্যাটিবিলিটির বিষয়টি গুরুত্ব রাখতে হবে।

উচ্চারণভিত্তিক (ফোনেটিক) ও ধ্বনিভিত্তিক ভাষা কি-বোর্ডে স্থান দেওয়ার বিষয়টি ফন্টের উন্নয়নে গুরুত্ববহ। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এমনকি সংগঠন ভিত্তিক ও ব্যক্তি উদ্যোগ কোনো কিছুকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে সরকারের ICT মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত উদ্যোগ আলোচনার দাবি রাখে।

"পূর্ণ" একটি অনন্য সাধারণ বাংলা ইউনিকোড ফন্ট। এতে ফন্ট সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পর ডিজাইন ও ডেভেলপ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা প্রকাশনায় প্রয়োজনীয় সকল টাইপোগ্রাফিক ফিচার। একইসঙ্গে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যকেও যথাযথভাবে প্রকাশ করছে এই ফন্ট। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার ছাড়াও এই ফন্ট মুদ্রণ কাজে এবং ওয়েবে ব্যবহার উপযোগী। ফন্টে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, বিরাম চিহ্ন, ইংরেজি বর্ণ, গাণিতিক চিহ্ন, অসমীয়া স্বতন্ত্র সেট, ইন্ডিক-বাংলা সমর্থনকারী গিফ, হোমোগ্রাফ, জনপ্রিয় আইকন/লোগোসহ প্রয়োজনীয় সকল গ্লিফ রয়েছে। ফন্টটির কিছু বৈশিষ্ট্যে রয়েছে। যেমন– স্বতন্ত্র ভিজুয়্যাল রূপ, একাধিক অ্যালোগ্রাফ, ল্যাটিন গ্লিফের সমতুল্য উচ্চতা, স্ট্যান্ডার্ড লাইন স্পেস এবং আকার এবং অপ্টিমাইজ করা গ্লিফ নম্বর, স্বচ্ছ ও সনাতন যুক্তবর্ণ উভয়ের সংযুক্তি ইত্যাদি। ফন্টটির স্বাভাবিক ভার্সন ছাড়াও বোল্ড, ইটালিক রূপ রয়েছে। ফন্টটি ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

সরকারি এসব উদ্যোগের সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত বেসরকারি উদ্যোগের একটি সমন্বয় প্রয়োজন। যাতে এক্ষেত্রে কার্যক্রমগুলো সাংঘর্ষিক না হয়ে সমন্বয়বাদী হয় এবং আখেরে নিরন্তর কর্মপ্রয়াস প্রয়োজন যাতে সকলের মেধা ও শ্রম-ঘামের সম্মিলন ফন্ট উন্নয়নের সারথি হয়।

তথ্য-নির্দেশ

হাজরা, সব্যসাচী। (২০২৪, ফেব্রুয়ারি ৫)। *প্রথম আলো*।

চক্রবর্তী, উজ্জ্বল। (২০২০)। *বাংলা হরফ কেন সবার সেরা*। কবি প্রকাশনী: ঢাকা।

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। (২০১৬)। *বর্ণপরিচয়*। শিশু সাহিত্য সংসদ: কলকাতা।

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। (১৯৮৪)। *বর্ণ পরিচয়*। সংসদ সংস্করণের বিজ্ঞাপন: কলকাতা।

কোরেশী, ফেরদৌস আহমদ। (১৯৯০)। *বাংলা বর্ণমালার এনাটমী*। সমীক্ষা প্রকাশনী: ঢাকা।

Bangla Font Blog। (২০২৩, ফেব্রুয়ারি ২২)। *দৈনিক সংবাদ*।

সিদ্দিক, মুহাম্মদ ইউসুফ। (২০২৩)। *বাংলা স্থাপত্যে আরবী-ফার্সী লিপিকার বৈচিত্র্য। জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা*।

ঘোষ, সো.। (২০২৩, ডিসেম্বর ২৭)। *ক্যালিগ্রাফার ও বুক ডিজাইনার সচিত্র উপস্থাপনা*।

চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা।
সরকার, পবিত্র। (২০২০)। *বাংলা লিখুন: নির্ভুল, নির্ভয়ে*। কথা প্রকাশন: ঢাকা।
https://www.prothomalo.com/bangladesh/g78m7j68k5
https://www.tbsnews.net/features/panorama/lipighor-inside-largest-foundrz-bangla-fonts-647686
https://www.behance.net/gallerz/53071543/A-Historz-of-Bengali-Tzpographz
https://issuu.com/nazimuddaulamilon/docs/amarbornomala

পরিশিষ্ট: ১

শিশু শিক্ষা (আদি) বইতে বাংলা ফন্টের নমুনা

পরিশিষ্ট: ২

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় বইতে বাংলা স্বরবর্ণ

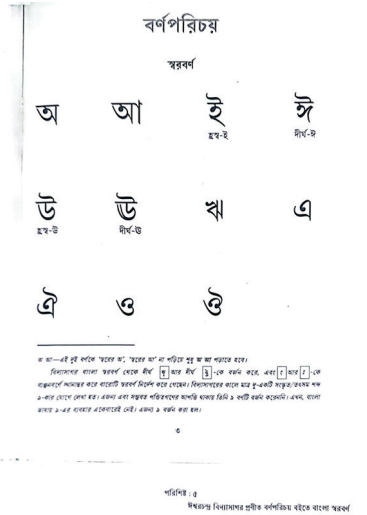

বর্ণপরিচয়

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই হ্রস্ব-ই	ঈ দীর্ঘ-ঈ
উ হ্রস্ব-উ	ঊ দীর্ঘ-ঊ	ঋ	এ
ঐ	ও	ঔ	

অ আ—এই দুই বর্ণকে 'স্বরের অ', 'স্বরের আ' না পড়িয়ে শুধু অ আ পড়াতে হবে।

বিদ্যাসাগর বাংলা স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ ৠ আর দীর্ঘ ৡ-কে বর্জন করে, এবং ং আর ঃ-কে ব্যঞ্জনবর্ণে স্থানান্তর করে বারোটি স্বরবর্ণ নির্দেশ করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের কালে মাত্র দু-একটি সংস্কৃত/তৎসম শব্দ ঌ-কার যোগে লেখা হত। এজন্য এবং সম্ভবত পণ্ডিতগণের আপত্তি থাকায় তিনি ঌ বর্ণটি বর্জন করেননি। এখন, বাংলা ভাষায় ঌ-এর ব্যবহার একেবারেই নেই। এজন্য ঌ বর্জন করা হল।

৩

পরিশিষ্ট : ৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় বইতে বাংলা স্বরবর্ণ

পরিশিষ্ট: ৩

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় বইতে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ

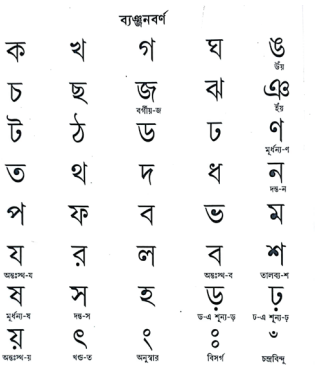

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ উঁয়
চ	ছ	জ বর্গীয়-জ	ঝ	ঞ ইঁয়
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ মূর্ধন্য-ণ
ত	থ	দ	ধ	ন দন্ত-ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য অন্তঃস্থ-য	র	ল	ব অন্তঃস্থ-ব	শ তালব্য-শ
ষ মূর্ধন্য-ষ	স দন্ত-স	হ	ড় ড-এ শূন্য-ড়	ঢ় ঢ-এ শূন্য-ঢ়
য় অন্তঃস্থ-য়	ৎ খণ্ড-ত	ং অনুস্বার	ঃ বিসর্গ	ঁ চন্দ্রবিন্দু

বিদ্যাসাগর ব্যঞ্জনবর্ণে ৎ (খণ্ড-ত)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ গণ্য করেননি। কেন-না খণ্ড-ত প্রকৃতপক্ষে হস্‌চিহ্নযুক্ত-ত (ত্)। কিন্তু ব্যাপক প্রচলন থাকায় ৎ-কে বর্জন করা অসম্ভব।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দুটি ব আছে। প্রথমটি 'বর্গীয়-ব'; দ্বিতীয়টি 'অন্তঃস্থ-ব'; বাংলায় দুটি ব-ই বর্গীয় ব-এর মতো উচ্চারিত হয়। যদিও 'অন্তঃস্থ-ব' দিয়ে এখন বাংলায় কোনো শব্দ শুরু হয় না, ব্যাকরণ শেখার প্রয়োজনে দুটি ব-কেই পৃথকভাবে জানা প্রয়োজন।

৬

পরিশিষ্ট : ৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় বইতে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় পদাণুঃ ব্যবহার ও বৈচিত্র্য

শুভেন্দু সাহা *

Abstract: Common clitics (t̪o, ɟe, ki, na, t̪a, koi̯, kæno, ba) used in Bangla are also used in Rabindranath Tagore's poetic language. However, there is a diversity in the use of clitics in poetic language as compared to spoken or prose language. Besides, Rabindranath used three special clitics in his poetic language, namely:'re', 'go' and 'lo'- which are not commonly used in prose. The purpose of this article is to analyze how the clitics are used in poetry, how it makes the poetic language diverse and how it differentiates the poetic language compared to the spoken and prose language, with a particular focus on the poetic works of Rabindranath Tagore. By following the text analysis method, this article discusses the use and diversity of clitics in Rabindranath Tagore's poetic language.

মূলশব্দ (Keywords): কাব্যভাষা, পদাণু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১. ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্যকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়– গদ্য সাহিত্য এবং কাব্য সাহিত্য। কাব্যভাষা বলতে কাব্য সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষাকে বোঝানো হয়। কাব্যভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে ছন্দ-মিল-অলংকার ব্যবহারে, বিশেষ ধরনের শব্দ প্রয়োগে এবং বর্গ ও বাক্যের ভিন্নধর্মী বিন্যাসে। কাব্যভাষাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য বিশেষ ধরনের যে সব শব্দ প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছেন তার মধ্যে

* Shuvendhu Saha, Assistant Professor, Dept. of Bangla, Noakhali Science and Technology University & PhD Fellow, IBS, University of Rajshahi.

অন্যতম হলো– পদাণু। পদাণু হচ্ছে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত অর্থহীন ছোটো শব্দ। এরা ক্রিয়া বিশেষণের মতো কাজ করে। এই শব্দগুলোর নিজস্ব অর্থ না থাকলেও এরা বাক্যে বিশেষ ভাব তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ ব্যাকরণিক শব্দের বাইরে যে সকল বিভক্তি বা শব্দাংশ বাক্য কাঠামোতে বিশেষ ইঙ্গিত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, সাম্প্রতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী এগুলোর নাম পদাণু (ইসলাম ও অন্যান্য, ২০১২: ১৮৯)। পদাণুগুলো আলাদা শব্দাংশ বা শব্দ যা নিয়মিত প্রসঙ্গের বাইরে কাজ করে। এগুলো বিশেষ মনোভাব বোঝাতে বা খেই ধরিয়ে দিতেও বাক্যে ব্যবহৃত হয় (টমসন, ২০২১: ১৪৮)। ল্যাটিন ব্যাকরণে একে 'ক্রমিক ক্রিয়া' বা 'সিরিয়াল ভার্ব' বলেও অভিহিত করা হয় (Zwicky, 1990, p. 3)। যদিও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত পদাণুর ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না। কেননা বাংলায় পদাণু ক্রিয়াকেন্দ্রিক নয়। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বইয়ে এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পরিভাষাটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেয়েছে (সরকার ও অন্যান্য, ২০২০: ৭৪)।

বাংলা ভাষার এই ক্ষুদ্র ভাষিক উপাদানটিকে পূর্ববর্তী বাংলা বৈয়াকরণগণ সর্বনাম ও অব্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে সর্বনাম বা অব্যয় পরিভাষাদ্বয়ের তুলনায় বাক্যে ব্যবহারের বৈচিত্র্য বিবেচনায় 'পদাণু' পরিভাষাটি অধিক যুক্তিপূর্ণ।

আকারে ক্ষুদ্র এই উপাদানগুলো বাক্যকাঠামোতে পদের মতোই বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তবে বাক্যে পদাণু স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু বিশেষ ভাব সৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখ্যভাষায় বিশেষ করে সাহিত্যের ভাষায় পদাণু বাক্যকাঠামোতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে মুখের ভাষা বা গদ্য সাহিত্যের ভাষায় পদাণুর ব্যবহারের সাথে অনেক ক্ষেত্রে কাব্যভাষায় পদাণু ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আবার পদ্যধারার কবিতা এবং গদ্যধারার কবিতার ভাষায়ও পদাণুর ব্যবহারে বৈচিত্র্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বাক্যকাঠামোতে পদাণু একটি বিশেষ অবস্থান তৈরি করেছে, যা বাংলা কাব্যভাষার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় এই পদাণুর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

২. বাংলা ভাষায় পদাণু

বাংলায় যে সকল অর্থহীন শব্দ বা শব্দাংশ পদাণু হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলো– 'তো', 'না', 'কি', 'যে', 'তা', 'বা', 'কই', 'কেন'। এগুলো সাধারণত ক্রিয়াবিশেষণের মতো কাজ করে (ইসলাম ও অন্যান্য, ২০১২: ১৮৯; টমসন, ২০২১: ১৪৮)। এছাড়া বাংলা কাব্যভাষায় কয়েকটি বিশেষ পদাণু লক্ষ করা যায়,

যেমন– 'রে', 'গো', 'লো'। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথাগত ব্যাকরণসমূহে ভাষার এই উপাদানগুলো বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হতো। যেমন রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে 'রে', 'গো', 'লো' শব্দগুলোকে সম্বোধনসূচক অব্যয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (রায়, ১৮৪৫: ১০৫)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে 'কি'-কে সর্বনাম এবং 'বা'-কে অব্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন (শহীদুল্লাহ্, ১৯৩৫: ৩২-৩৭)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছু পদাণুকে সর্বনাম (তা, গো, রে, কেন) এবং কিছু পদাণুকে অব্যয় (তো, কি, লো) হিসেবে উল্লেখ করেছেন (ঠাকুর, ১৯৩৮)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কিছু পদাণুকে (তা, যা, কি, কই) সর্বনামের বিভিন্ন প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৫: ২৪৬-৬০)। বাংলা বাক্যে এই শব্দাংশ বা শব্দগুলো ব্যবহারের বৈচিত্র্য, ভাব ও আকার বিবেচনায় একে পদাণু হিসেবে উল্লেখ করাই ভালো।

ভাষার কথ্য ও গদ্যরূপের তুলনায় কবিতার বিষয়বস্তুতে আবেগের বিষয়টি তুলনামূলক বেশি হওয়ায় পদাণুর ব্যবহারে বৈচিত্র্য বেশি হয়। এটি একই সাথে কাব্যভাষার রূপতাত্ত্বিক একটি বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করে আবার ভাবপ্রকাশক উপাদান হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পদাণু বাংলা বাক্যে বিশেষ ইঙ্গিত, যেমন– বিদ্রূপ, রসিকতা, নিশ্চয়তা, শ্লেষ, সংকোচ, সন্দেহ, নিশ্চয়তা, দ্বিধা, বিশেষ অনুরোধ বা অনুজ্ঞা, প্রশ্ন, ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা, সংযোগ, ঘটনার সংক্ষিপ্ততা, নির্দেশক, মৃদু বিস্ময় ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই গদ্য বা মুখের ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে কাব্যভাষায় এগুলো ছাড়াও ধ্বনিগত পরম্পরা রক্ষায়, শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টিতে এবং গানে সুরারোপের ক্ষেত্রে পদাণু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পদাণু না বসলেও যেখানে বাক্য পূর্ণ হতে পারে সেখানে কবিরা বাক্যের মধ্যে অলগ্ন উপাদান হিসেবে পদাণুর ব্যবহার করে কবিতার ভাষাকে আবেদনময় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন।

কবিতায় ছন্দ ও ধ্বনি-পরম্পরা বজায় রাখা, গানের সুরারোপ, ভাব প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হিসেবে পদাণুর যে ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রয়েছে, তা কাব্যের ভাষাকে কথ্য ও গদ্যভাষা থেকে পৃথক করতে ভূমিকা পালন করে। তাঁর কবিতায় প্রচলিত পদাণু ছাড়াও কাব্যভাষিক পদাণুগুলোর ব্যবহার রয়েছে। তবে এসব পদাণুর বিশিষ্টতা শুধু ব্যবহারে নয়, বরং ভাষার কথ্য ও গদ্যরূপে পদাণুর ব্যবহারের তুলনায় কবিতায় বাক্যকাঠামোতে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে বাংলা ভাষার প্রচলিত পদাণু এবং কাব্যভাষিক পদাণুগুলোর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো (ঠাকুর, ২০১০)।

৩. 'তো' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় পদাণু হিসেবে 'তো' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে এর বহুমাত্রিক ব্যবহার দেখা যায়। মূলত কিঞ্চিৎ সংশয়ার্থে, তাহলে বা তবে অর্থে, নিশ্চয়ার্থে এবং ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে বাংলা বাক্যে 'তো'-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় এর ব্যবহার কেমন তা এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে বাংলা কাব্যের ভাষায় 'তো' পদাণুটি কী বিশেষ ভাব প্রকাশ করে তা ফুটে উঠবে।

কিঞ্চিৎ সংশয়ার্থে	সে **তো** প্রেতের অন্ন ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ করা
নিশ্চয়ার্থে	সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে নাবার জন্য করব না **তো** তাড়া
ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা	রাবণ আমার করবে কী মা নেই **তো** আমার সীতা
উপেক্ষা/বেপরোয়া ভাব প্রকাশে	ভাঙে **তো** ভাঙিবে ভাঙিবে বাদ্য, ছেড়ে **তো** ছিঁড়িবে তন্ত্রী
কিঞ্চিৎ সন্দেহ অর্থে	এই **তো** তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ
প্রত্যয় প্রকাশে	আমি তাই ব'লে তো কপালে কর হানবো না
সম্বোধনে জোর প্রয়োগ	ওগো তোরা বল্ **তো** এরে ঘর বলি কোন্ মতে
কার্যকরণ সম্পর্ক বোঝাতে	সকল বিরোধ তাই **তো** তোমায় চরমে হারায় বাণী
মৃদু বিস্ময়	একটি ছোটো মানুষ তাঁহার একশো রকম রঙ্গ **তো**
'কিন্তু'-র বদলে তো	দোষ দিব কারে শাস্তি **তো** পেয়েছ তুমি এতোদিন সেই রুদ্ধদ্বারে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে	হে আমার নাথ, এই **তো** তোমার দান
অনুযোগ প্রকাশে	তাই **তো** কারো হয় না আসা আমার একার ঘর

বাংলা কথ্যরূপের মতো কাব্যের ভাষায়ও 'তো'-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। বাংলা ভাষার কথ্যরূপ ও গদ্যরূপ থেকে কাব্যভাষায় 'তো'-এর ব্যবহার বেশি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে দেওয়া উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– পঙ্‌ক্তিগুলোতে 'তো' পদাণুটি না থাকলেও বাক্য সম্পূর্ণ হতে পারতো।

তবে সেক্ষেত্রে ভাব অসম্পূর্ণ থেকে যেতো বা ভাব প্রকাশে ভিন্নতা থাকতো। কিন্তু 'তো' পদাণু ব্যবহারের ফলে কবিতার বাক্যগুলোতে বিশেষ ভাব যেমন– কিঞ্চিৎ সংশয়, নিশ্চয়তা, ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা, উপেক্ষা বা বেপরোয়া ভাব, কিঞ্চিৎ সন্দেহ, প্রত্যয়, সম্বোধনে জোর প্রয়োগ, কার্যকরণ সম্পর্ক, মৃদু বিস্ময়, কিন্তু শব্দের বিকল্প, কৃতজ্ঞতা ও অনুযোগ প্রকাশে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কবিতার ভাষায় তাহলে বা তবে এর বিকল্প হিসেবে 'তো' ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে 'তো' কবিতার ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যে একটি ছোটো উপাদান হিসেবেও শব্দগুলোতে বিশেষ জোর প্রদান করে। ফলে কবিতার ভাষার কাঠামো কথ্য ভাষা বা গদ্যভাষা থেকে পৃথক হয়। এছাড়া শব্দে বিশেষ জোর বা বল প্রয়োগকারী হিসেবে 'তো' বলক লগ্নক (কোনো শব্দে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার জন্য বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোতে কিছু লগ্নক ব্যবহৃত হয় যা বলক নামে পরিচিত। বাংলায় বলক হিসেবে 'ই', 'ও', 'তো' ব্যবহৃত হয়) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– "ছোটোবড়ো" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "এখনো **তো** বড়ো হইনি আমি, ছোটো আছি ছেলেমানুষ বলে"। এখানে কবি চাইলে 'এখনো বড়ো হইনি আমি' লিখতে পারতেন। কিন্তু বাক্যে জোর প্রয়োগ করার জন্য 'তো' বলকের ব্যবহার করলেন। লক্ষ করার মতো বিষয় এখানে 'তো' 'এখনো' শব্দটির সাথে লেগে না থাকলেও এবং বল প্রয়োগ (শব্দ এবং বাক্যে) করার কারণে পদাণুর পাশাপাশি বলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা মূলত এক ধরনের লগ্নক। অর্থাৎ 'তো' লগ্নক ও অলগ্নক উপাদান হিসেবে বাংলা কাব্যভাষায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে। এখানে লগ্নকের সাথে পদাণুর কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পদাণু লগ্নকের মতো বাক্যে প্রতিবেশী শব্দগুলোর সাথে মিশে যায় না, উচ্চারিতও হয় আলাদাভাবে, কাজ করে ক্রিয়াবিশেষণ ও যোজকের মতো। যেহেতু আকারে ক্ষুদ্র এবং অন্য শব্দের সাথে লেগেও থাকে না, তাই একে অলগ্নকও বলা যেতে পারে (সরকার, ২০২১: ১০৬)।

৪. 'না' পদাণুর ব্যবহার

বাংলায় 'না' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে এক ধরনের নেতিবাচক অর্থ তৈরি হয়। তবে সবসময় ভাষায় 'না' শব্দটির ব্যবহার একরকম নয়। বাংলা ভাষায় 'না' একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দ, যা পদাণু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে বহুবিধ অর্থ তৈরি করে। কবিতার ভাষায় 'না'-এর ব্যবহার কেমন সেটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

আধিক্য বোঝাতে	কত **না** পুরানো কথা, কত **না** হারানো গান কত **না** প্রাণের দীর্ঘশ্বাস

অনুজ্ঞা বোঝাতে	যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিয়ো না নিয়ো **না** কেড়ে নিও **না** নিও না মন মোর
মৃদু বিস্ময় বোঝাতে	**না** জানি কেমনে পশিল হেথায় পথহারা তার একটি তান
ব্যাপ্তি বোঝাতে	দুটো দিন **না** যাইতে কেঁদে কয় মোষ আর কাজ নেই প্রভু, হয়েছে সন্তোষ।
দ্বিধাজনিত সংযোগ	অস্তিত্ব আছে **না** আছে, ক্ষীণ খর্বদেহ, বাক্য যবে বাহিরায় **না** থাকে সন্দেহ।
প্রশ্ন সহায়িকা হিসেবে	ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া **না** পাস কেন, আশা, কেন তোর কিসের তরাস
নিষেধ বোঝাতে	স্রোতোমুখে ভাসিস **নে** আর যাহা পাস আঁকাড়িয়া ধর্
নিশ্চয়ন বোঝাতে	তবু তো তার সঙ্গে আমার বিবাদ করা সাজে **না** সে নইলে যে তেমন করে ঘরের বাঁশি বাজে **না**

পদাণু হিসেবে 'না'-এর ব্যবহার গদ্য বা কথ্য ভাষায়ও রয়েছে। তবে কবিতার ভাষায় 'না' পদাণুর ব্যবহার কথ্য বা গদ্য ভাষার তুলনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ ছাড়া ব্যাপ্তি, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা, আধিক্য, প্রশ্ন ও নিশ্চয়ন বোঝাতে 'না' পদাণুর ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। তবে কবিতার ভাষায় নেতিবাচক অর্থের বাইরে 'না'-এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের অন্যতম কারণ বিশেষ ভাবাবেগ এবং ধ্বনিগত সঙ্গতি। সেই সঙ্গতির প্রয়োজনে 'না' পদাণুটি 'নে' বা 'নি'তেও পরিণত হতে পারে, আবার মিলকরণেও অংশ নিতে পারে।

৫. 'কি' পদাণুর ব্যবহার

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কি' শব্দটিকে প্রশ্নসূচক সর্বনাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৫: ২৫৪-৫৫)। সাধারণত বাংলা কথ্য বা গদ্যভাষায় 'কি' পদাণু দিয়ে সাধারণ প্রশ্নবাচক বাক্যের হ্যাঁ-না উত্তর পাওয়া যায় বলে বিভিন্ন ব্যাকরণে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় 'কি' শব্দটি এমন অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে এই যুক্তি অচল। এই 'কি'-গুলোকে সবসময়ে প্রশ্নশব্দ বলা যাবে না। বাক্যের ভাব সৃষ্টিতে এরা ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এগুলো বাক্যে অপরিহার্য নয় (সরকার, ২০২১: ১০৯-১০)। 'কি'-কে তাই পদাণু বলা যেতে

পারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই 'কি' পদাণু কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক:

মৃদু বিস্ময় অর্থে	ও **কি** বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল। ও **কি** ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ। ও **কি** দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।
পরিমাণ বা ব্যাপ্তি বোঝাতে	দেখিবে কত **কি** অভূত ঘটনা কত **কি** অভূত ছবি!
মৃদু সন্দেহ	রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী **কি** বরণের ডালি মরণের কূলে।

বাংলা কথ্য ভাষায় 'কি' দিয়ে হ্যাঁ/না উত্তরই বেশি পাওয়া যায়। তবে বাংলা গদ্য বা কাব্যভাষায় 'কি' হ্যাঁ/না এর বাইরে বিস্তারিত অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেও ভূমিকা পালন করে। কবিতার ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ভাবের বহুমাত্রিক ব্যবহার করতে গিয়ে 'কি' পদাণুটি ব্যবহার করেছেন। তিনি ভাবপ্রকাশে 'কি' এবং 'কী' উভয় শব্দই ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। যেমন– "পার কি বলিতে কেহ" কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে তিনি লিখলে, 'পার কি বলিতে কেহ কী হল এ বুকে'। এই বাক্যে 'কি' পদাণু ব্যবহার না করেও লেখা যেতো, অর্থাৎ– পার বলিতে কেহ, কী হলো এ বুকে।' তবে 'কি' পদাণু ব্যবহার করে বাক্য উচ্চারণের সময় ভাবের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। মূলত ভাব প্রকাশে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কবিতার ভাষায় 'কি' পদাণু ব্যবহৃত হতে পারে।

৬. 'যে' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ 'যে'। অভিধানে এর অর্থ লেখা না হলেও এটি বাক্যের অর্থ সৃজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'যে' ব্যবহারের ফলে বক্তব্য নরম বা কোমল হয় (টমসন, ২০২১: ১৫০)। এটি অনেকটা 'তো'-এর মতো। তবে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে 'তো'-এর তুলনায় এর প্রভাব কম। পদাণু হিসেবে 'যে'-এর অনেক ব্যবহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় 'যে'-এর বহুমাত্রিক ব্যবহার উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–

নির্দেশক হিসেবে	খোকার ঠোঁটে **যে** হাসিখানি চমকে ঘুমঘোরে– কোন দেশে **যে** জনম তার কে কবে তাহা মোরে
মৃদু বিস্ময় বোঝাতে	ওরা কেন **যে** হেসে সারা কেন **যে** করে এমন ধারা
অনুযোগ অর্থে	সে **যে** ভুলে গেছে মালা গাঁথা শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
বিশেষ/মাহাত্ম্যপূর্ণ অর্থে	আজি **যে**-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?
সাপেক্ষ সর্বনাম হিসেবে	**যে** গান আমি নারিনু রচিবারে সে গান আজি উঠিল চারি ধারে
আধিক্য বোঝাতে	বাগানে ওই দুটো গাছে ফুল ফুটেছে কত **যে**
ব্যাপ্তি বোঝাতে	পুরানো এই মোদের ঘরে গৃহদেবীর কোলের পরে কতকাল **যে** লুকিয়ে ছিলি কে জানে
ঘটনার পরম্পরা বোঝাতে	কতই পাখি তোমার শাখে বসে **যে** চলে গেছে ছোটো ছেলেরে তাদেরই মতো ভুলে কি যেতে আছে
স্থান নির্দেশক হিসেবে	সৃজনের পরপ্রান্তে **যে** অনন্ত অন্তঃপুরে কভু দৈববশে

বাংলা ভাষায় 'যে' শব্দটি যোজক হিসেবে কাজ করে, আবার সর্বনাম হিসেবেও কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় 'যে' শব্দটি সর্বনাম হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। বাংলা বাক্যে সাপেক্ষ সঙ্গী হিসেবেও 'যে'-এর ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের ব্যবহারেও 'যে' বহুমাত্রিক ভাব সৃষ্টি করে। কাব্যভাষায় 'যে' এ সকল বিষয়ের বাইরে বিশেষ ভাব সৃজন ছাড়াও ছন্দ ও ধ্বনিগত

পরম্পরা বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক্ষমিতে পারিলাম না **যে**
ক্ষমো হে মম দীনতা
পাপীজনশরণ প্রভু!
মরিছে তাপে মরিছে লা**জে**

উপরের কবিতাংশে প্রথম চরণের সাথে চতুর্থ চরণের মিলকরণেও (যে>লাজে) পদাণুর ব্যবহার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যবহৃত 'যে' পদাণুটি বিশ্লেষণ করলে ভাবপ্রকাশক হিসেবে এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে এই বক্তব্যের যর্থাথতা মেলে। একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো, কোনো কিছুকে নির্দেশ করতে 'যে' এর ব্যবহার বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয়ই হতে পারে।

৭. 'তা' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় 'তা' ক্রিয়াবিশেষণ নয়, বরং সর্বনাম হিসেবে কাজ করে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'তা' শব্দটিকে প্রথম পুরুষের সর্বনাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৫: ২৫৩)। 'তা' একটি অজীব সর্বনাম (মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী, বিষয়, ধারণা, ঘটনাকে অজীব সর্বনাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়)। এর অর্থ এটা ও সেটা। 'তা' কর্তা ও কর্ম হিসেবে বসলে এই অর্থ প্রকাশ পায়। তবে যখন 'তা' দ্বারা কিছুটা ইতস্তত করা বা অন্য কোনো শব্দ খোঁজার বিষয়টি ইঙ্গিত করা হয়, তখন 'তা' শব্দটি পদাণু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কবিতায় এর ব্যবহার তুলনামূলক কম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদাহরণ দিলে এর বৈশিষ্ট্য বিচার করা সম্ভব।

মহারাজা ভয়ে থাকে পুলিশের থানাতে আইন বানায় যত পারে না তা মানাতে	প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে জানতে পার নি তা	হিসেব আমার মিলবে না তা জানি যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি

সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিঘির পাড়ে বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে	যা পাব তা পথেই পাব দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও	কার ব্যথা যে জানায় তারা জানিনে তা হেথা হতে কী নিয়ে বা যায় রে সেথা

উদাহরণগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়– 'তা' এখানে অজীব সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। যার মূল অর্থ 'এটা' বা 'সেটা'। উপরের ছয়টি উদাহরণেও 'তা' শব্দটি 'এটা' বা 'সেটা' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ষষ্ঠ উদাহরণে চরণের শেষে 'তা' ব্যবহার করা হয়েছে পরবর্তী চরণের সাথে মিলকরণের স্বার্থে (তা>সেথা)। কবিতায় পদাণু ব্যবহারের এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে কেবল ধ্বনিগত সঙ্গতি বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সে কারণে বলা যায়– পদাণু সর্বদা অর্থ প্রকাশে সরাসরি অংশ না নিলেও মিলকরণ ও ছন্দের প্রয়োজনে বাক্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে কবিতায় মিলের প্রয়োজনে 'তা' সর্বদা পদাণু হিসেবে না বসে স্বতন্ত্র অর্থও প্রকাশ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় এর উদাহরণ রয়েছে। যেমন–

আমি বাপু ভালো মানুষ
মুখে নাইকো রা
ঘরের কোণে বসে বসে
গোঁফে দিচ্ছি তা

এখানে 'তা' শব্দটি নির্দেশক বা পদাণু হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ– যত্ন নেওয়া। অর্থাৎ 'গোঁফে দিচ্ছি তা' গোঁফের যত্ন নেওয়াকে নির্দেশ করে।

৮. 'বা' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা কথ্য ও লেখ্যভাষায় পদাণু হিসেবে 'বা' ব্যবহৃত হয়। তবে যোজক হিসেবেই 'বা'-এর ব্যবহার বেশি। মূলত 'অথবা'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 'বা'। 'বা' অনেক সময় প্রশ্নশব্দের সাথেও বসে। তখন 'বা' পদাণুটির মাধ্যমে অসহায়ত্ব বা মৃদু সন্দেহ প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়ও এমন উদাহরণ রয়েছে।

অথবা/কিংবা অর্থে	কেহ **বা** জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া কেহ **বা** স্বপনে ডরিছে
মৃদু সন্দেহ প্রকাশে	যদিও **বা** নাহি আসে তবু বৃথা আশ্বাসে
নিশ্চয়ন অর্থে	যা চিরকালের তা যদি আজ যদি **বা** ঢাকা পড়ে কাল উঠবে জেগে
প্রশ্নের অনুষঙ্গ হিসেবে	লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে, ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে এ কথা শুনিবে কে **বা**
আছে অর্থে	শুধু ছিটের এক কাপড় শুনি রায়মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয় সেজন্য ভাবনা কি **বা** তোর
অনুযোগ অর্থে	নাই **বা** বুঝিনু কিছু, নাই **বা** বলিনু নাই **বা** গাঁথিনু গান, নাই **বা** চলিনু
পরিমাণ নির্দেশ করতে	প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে কত **বা** উঠিছে মেলিয়া–

কথ্য ভাষা এবং গদ্য ভাষাতে যোজক হিসেবেই 'বা'-এর ব্যবহারে বৈচিত্র্য বেশি। কবিতার ভাষাতেও এটি যোজকের কাজ করে। তবে কাব্যভাষায় যোজকের তুলনায় পদাণু হিসেবে 'বা'-এর বৈচিত্র্য বেশি। পদাণু হিসেবে 'বা' এর যে ব্যবহার অর্থাৎ (নিশ্চয়ন, মৃদু সন্দেহ প্রকাশ, অনুযোগ, পরিমাণ নির্দেশক) তা কবিতার ভাষাকে পাঠকের কাছে শ্রুতিমধুর করে উপস্থাপন করে। ফলে মুখের ভাষার সাথে কবিতার ভাষার পার্থক্য বোঝা যায়। কথ্য বা গদ্যরূপে পদাণু হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও সাপেক্ষ সঙ্গী হিসেবেও 'বা' 'যদি' শব্দটির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন: **'যদিওবা** সে কাজটি করেনি, তাও তাকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়।' এই বাক্যে 'যদি' শব্দটির সাথে 'ও' বলক এবং 'বা' সাপেক্ষ সঙ্গী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. 'কই' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় 'কই' মূলত প্রশ্নশব্দ। 'কই' শব্দটিকে অপ্রাণীবাচক সর্বনামও বলা হয় (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৫: ২৫৫)। কথ্য বা গদ্যের ভাষায় শুধু 'কই' দিয়ে একটি বাক্য পূর্ণ হতে পারে। এই শব্দটিকে পদাণু হিসেবে বিবেচনা নাও করা যেতে পারে। তবে

কবিতায় এদের ব্যবহার অনেক সময় পদাণুর ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজ হবে। 'কই' পদাণু হিসেবে মূলত প্রশ্নশব্দ, বিস্ময়, হতাশা ইত্যাদি অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নশব্দ	মথুরায় উপবন কুসুমে সাজিল ওই বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল **কই?**
বিস্ময়	কোথা বুক-জোড়া খোলা হাওয়া, সাগরের খোলা হাওয়া **কই**!
হতাশা	চিঠি **কই**! দিন গেল বইগুলো ছুঁড়ে ফেলো, আর তো লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া। মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া।

১০. 'কেন' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় 'কেন' শব্দের স্বকীয়তা রয়েছে এবং এটি মূলত প্রশ্নশব্দ। কথ্য বা গদ্যের ভাষায় শুধু 'কেন' দিয়েও একটি বাক্য পূর্ণ হতে পারে। এই শব্দটিকে পদাণু হিসেবে বিবেচনা নাও করা যেতে পারে। তবে কবিতায় 'কেন' ব্যবহার অনেক সময় পদাণুর ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজ হবে। 'কেন' পদাণু হিসেবে মূলত প্রশ্নশব্দ, আক্ষেপ, অভিমান ইত্যাদি অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়।

আক্ষেপ	বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি, তবু আজ দেখা হল না **কেন**
অভিমান প্রকাশে	চমকে জেগে উঠে দেখল আমাকে, তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে অভিমানভরে বললে, "ছি, ছি, **কেন** জাগালে না এতক্ষণ। **কেন**! আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমত।

'কই' এবং 'কেন' প্রশ্নশব্দ হিসেবে ভূমিকার বাইরে বিস্ময় প্রকাশক শব্দ হিসেবে পদাণুর মতো কাজ করে। এই বিস্ময় প্রকাশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতাশা ও আক্ষেপের পরিমাণই বেশি।

১১. 'রে' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা ভাষার কথ্য ও গদ্যরূপের সাথে কাব্যভাষার পদাণুর ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। বাংলা কাব্যভাষায় প্রচলিত পদাণুগুলোর বাইরে তিনটি পদাণু ব্যবহার হয়; যথা– 'রে', 'গো' এবং 'লো'। 'রে' বাংলা ভাষায় পুরুষের সম্বোধনে অসম্মানার্থে ব্যবহৃত হয় বলে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে (রায়, ১৮৪৫: ১০৬)। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে 'রে' শব্দটি অসম্মান বা স্নেহ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় বলে উল্লেখ করেছেন (ঠাকুর, ২০১০: ৬২০)। 'রে' পদাণুটির বহুঅর্থবোধকতা রয়েছে বিধায় এটি কবিতার ভাষায় বিশেষ ভাব সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতায় এই 'রে' পদাণুর ব্যবহার রয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই পদাণুর ব্যবহার করেছেন এমনটি বলা যাবে না। তাঁর পূর্বে চর্যাপদ ও মধ্যযুগের সাহিত্যে এর ব্যবহার রয়েছে। আধুনিক যুগের সূচনাতেও কবিরা এর ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কবিরাও এর ব্যবহার করেছেন। তবে তুলনামূলক কম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ব্যবহৃত 'রে' পদাণুটির বহুমাত্রিক ব্যবহার তুলে ধরা হলো–

নিশ্চয়ন অর্থে	ধন্য **রে** আমি অনন্ত কাল, ধন্য আমার ধরণী। ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর তারকা হিরণ-বরনী।
মৃদু বিস্ময় প্রকাশে	ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়, 'কেন **রে** ভারত কেন তুই, হায়, আবার হাসিস্! হাসিবার দিন আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।
আহ্বান অর্থে	অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায়। আয় শান্তি, আয় **রে** নির্বাণ, আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়!

নেতিবাচক শব্দের অনুষঙ্গ হিসেবে	না **রে**, তোদের ফিরতে দেব না রে মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায় সেই আরামের দ্বারে।
ইচ্ছা প্রকাশক হিসেবে	সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী দুই পারের এই কানাকানি তাই শুনে যে উদাস হিয়া চায় **রে** যেতে বাসা ছাড়ি।
উপহাস অর্থে	হায় আমি, হায় **রে** ভূস্বামী, এখানে তুলিছ বেড়া উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ এই মাটিতে সে-ই রবে লীন।
অনুপ্রেরণার অনুষঙ্গ হিসেবে	ছিন্ন পালটি তুলে ভেসে যা **রে** স্বপ্ন-সমান অস্তাচলের কূলে।
দুঃখ প্রকাশক হিসেবে	হঠাৎ আমার গান থেমে যায় বারে বারে। জীবনবীণা ঠিক সুরে আর বাজে না **রে**।

কাব্যভাষায় 'রে' পদাণু ব্যবহারের মাত্রা অনেক বেশি। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলি এবং আধুনিক যুগের গানের সুরারোপের ক্ষেত্রে 'রে' একধরনের ধুয়া তৈরি করে। অর্থাৎ গান রচনা ও সুরারোপ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় 'রে' পদাণু যুক্ত করে কাব্যের ভাষায় একটি বিশেষ দ্যোতনা সৃষ্টি করা হয়। বাউল, পদাবলি, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীতের ক্ষেত্রে গীতিকারগণ 'রে' পদাণুর ব্যবহার করেছেন, যা সুরের মাধুর্য সৃষ্টির পাশাপাশি বহুমাত্রিক অর্থপ্রকাশক হিসেবেও কাজ করে থাকে।

১২. 'গো' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা গদ্যভাষায় 'গো' পদাণুর ব্যবহার নেই। তবে বাংলা কথ্য রূপে বিশেষ করে বললে আঞ্চলিক রূপে 'গো' পদাণুটির ব্যবহার রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের সম্বোধনে বিশেষ আদরার্থে 'গো'-এর ব্যবহার রয়েছে (রায়, ১৮৪৫: ১০৬)। তবে আঞ্চলিক বা কথ্যরূপ ছাপিয়ে 'গো' পদাণুটির বিচিত্র ব্যবহার পাওয়া যায় কবিতার

ভাষায়। তাই একে কাব্যভাষিক পদাণু বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানে এই পদাণুর ব্যবহার করেছেন।

অনুরোধ বা অনুজ্ঞা প্রকাশে	ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে, শেষ হল মোর গান এবার প্রভু, লও **গো** শেষের দান।
অভিমান প্রকাশক হিসেবে	বুঝি গো আমি বুঝি **গো** তব ছলনা, যে কথা তুমি বলিতে চাও সে কথা তুমি বল না।
প্রশ্ন প্রকাশক হিসেবে	আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো। কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে **গো**।
নিশ্চয়ন অর্থে	তার অন্ত নাই **গো** যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ। তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ। ও তার অন্ত নাই গো নাই।
প্রত্যাশা প্রকাশক হিসেবে	কাব্য যেমন কবি যেন তেমন নাহি হয় **গো**। বুদ্ধি যেন একটু থাকে, স্নানাহারের নিয়ম রাখে, সহজ লোকের মতোই যেন সরল গদ্য কয় গো।
সম্বোধন প্রকাশে	কোন সাগরের তীরে মা **গো**, কোন পাহাড়ের পারে, কোন রাজাদের দেশে মা **গো**, কোন নদীটির ধারে।
মৃদু বিস্ময় প্রকাশে	হৃদয়, কেন **গো** মোরে ছলিছ সতত, আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
মৃদু তোষামোদ প্রকাশে	তোমার তারায় মোর আশাদীপ রাখিব জ্বালি। তোমার কুসুমে আমার বাসনা দিব **গো** ঢালি।

'গো' পদাণু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে কবিতা বা গানে বিশেষ ভাব সৃষ্টির পাশাপাশি ছন্দ ও ধ্বনিগত সঙ্গতি বজায় রাখে। উপরিউক্ত কবিতাংশগুলোর মধ্যে তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদাহরণের দিকে দৃষ্টি দিলে এই বক্তব্যের যথার্থতা মেলে। 'গো' পদাণু ব্যবহারের ফলে কবিতার ভাষায় একধরনের বিশেষ আবেদন সৃষ্টি হয়, যা মুখের ভাষা বা গদ্যে দেখা যায় না।

১৩. 'লো' পদাণুর ব্যবহার

বাংলা কথ্য বা গদ্যরূপে 'লো' পদাণুর ব্যবহার নেই। তবে কবিতার ভাষায় খুব অল্প পরিমাণে হলেও 'লো' পদাণুর ব্যবহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থে 'লো' পদাণুর ব্যবহার করেছেন; 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'কবিতা'। তবে তাঁর বেশ কিছু কাব্যনাটকে 'লো' পদাণুর ব্যবহার পাওয়া যায়। একটি বিষয় লক্ষণীয়, 'লো' পদাণুটি নারীদের ভাষিক সম্বোধনে ব্যবহৃত হয় বলে রাজা রামমোহন রায় তাঁর ব্যাকরণে উল্লেখ করেছিলেন (রায়, ১৮৫৪: ১০৬)। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথও এই মত সমর্থন করেছিলেন (ঠাকুর, ২০১০: ৬২০)। 'তুই' শব্দ যোগে এটি ব্যবহৃত হয় এবং ভদ্রসমাজে ব্যবহারবর্জিত বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর কবিতায় নারী সম্বোধনেই 'লো' আন্তরিক ভাবপ্রকাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য পদাণুর মতো 'লো' পদাণুরও নিজস্ব অর্থ না থাকলেও বাক্যের মধ্যে বসে এটি অর্থের বহুমাত্রিক ভাব সৃষ্টি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে এর উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

সম্বোধনসূচক নির্দেশক হিসেবে	সখি **লো**, সখি **লো**, বোল ত সখি **লো**, যত দুখ পাওল রাধা নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে পাওল তছু কছু আধা?
আহ্বান অর্থে	গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে, বিসরি ত্রাস - লোকলাজে সজনি, আও আও **লো**।
অনুরোধ অর্থে	বাজা **লো** ললনে! বাজা একবার হৃদয় ভরিয়ে মধুর ঘুমে!
হতাশা প্রকাশক	আমরণ কেঁদে কেঁদে, কাটিয়া যাইবে দিন, নীরব আগুনে মন পুড়ে হবে ছাই **লো**!

'লো' পদাণুও 'গো' এবং 'রে' পদাণুর মতো ছন্দ ও ধ্বনিগত সঙ্গতি বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়। এই পদাণুটি গানে একধরনের ধুয়া সৃষ্টি করে। ফলে সুরারোপের ক্ষেত্রে গান অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়।

১৪. পর্যালোচনা

বাংলা ভাষায় রচিত প্রচলিত ব্যাকরণসমূহে শব্দরূপ বিশ্লেষণে পদাণু নিয়ে আলোচনা খুবই সাম্প্রতিক। এর পূর্বে বৈয়াকরণিকরা ভাষিক এই ছোটো উপাদানটিকে নানা অভিধায় বিশ্লেষণ করেছেন। সমকালীন ব্যাকরণসমূহে পদাণু নিয়ে যে আলোচনা তাও মূলত কথ্য ও গদ্য ভাষার ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। তবে কাব্যভাষায় এই ভাষিক উপাদানের ব্যবহার কেমন তা অনালোচিত থেকেছে। তাই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করার জন্য কথ্য ও গদ্য ভাষার মতো কাব্যের ভাষাতেও যে পদাণুর ব্যবহার রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাতে সবগুলোর পদাণুরই ব্যবহার করেছেন এবং কাব্যে বিশেষ ভাব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা কাব্যচর্চায় গদ্যভাষিক কবিতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এসময় কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুগত বহুমাত্রিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভাষিক কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এছাড়াও ক্রিয়াপদের সাধুরীতির বদলে চলিতরীতির ব্যবহার, কাব্যিক কিছু সর্বনাম (অয়ি, আপনা, মম, মোর, তব), কবিতার গীতলয়তা ইত্যাদির ব্যবহার ধীরে ধীরে বর্জিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গদ্যভাষিক কবিতায় অন্যান্য পদাণুর ব্যবহার হলেও 'রে', গো' এবং 'লো' পদাণুর ব্যবহার কমে আসে। এমনকি রবীন্দ্রনাথও ত্রিশের দশকে 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে যেসব গদ্যভাষিক কবিতা রচনা করেছেন তাতে এই পদাণুগুলোর ব্যবহার করেননি। গদ্যভাষিক কবিতায় এই তিনটি পদাণুর ব্যবহার কমে গেলেও এখনও এই পদাণুগুলো বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপে, পারিবারিক পরিমণ্ডলে নারীবাচক শব্দ বা আদরার্থে সম্বোধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্যান্য যে সকল পদাণু– তা, যে, কি, না, তা, কই, কেন, বা বাংলা গদ্য ভাষায় এবং কাব্যভাষায় একই রকম ভাব সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। তবে কাব্যভাষায় ছন্দ, মিলের ধ্বনিগত সঙ্গতি রক্ষার স্বার্থে পদাণুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যা এই প্রবন্ধে উঠে এসেছে।

১৫. উপসংহার

ভাষিক উপাদান ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের পারঙ্গমতা সর্বজনবিদিত। শব্দের প্রয়োগ নিয়ে তাঁর সচেতনতা এবং শ্রুতিমাধুর্যের বিবেচনা খুব সহজেই বোঝা যায়। ভাষিক

উপাদান হিসেবে পদাণুর যথাযথ ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের বিষয়টিও যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, উপরের আলোচনায় তা দেখা গেছে। বিশেষভাবে সূক্ষ্মতর ভাব ও আবেগ সঞ্চারের কাজে পদাণুর ব্যবহার যে কাব্যভাষার অপরিহার্য কৌশল হিসেবে কাজে লাগতে পারে, সেটাও উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। দেখা গেছে কবিতার অন্ত্যানুপ্রাসকে অধিক মনোগ্রাহী করতেও রবীন্দ্রনাথ পদাণুর ব্যবহার করেছেন। কাব্যভাষায় প্রচলিত বিশেষ কয়েকটি পদাণু যেমন 'রে', 'গো', 'লো' ইত্যাদির বিশিষ্ট ব্যবহারও তাঁর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য দান করে।

কাব্যভাষায় পদাণুর এই ব্যবহার ও বিশিষ্টতা শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ই দেখা যায়, তা নয়। এটি চিরায়ত বাংলা কাব্যভাষারই বৈশিষ্ট্য। হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষার অসংখ্য কবি তাঁদের কাব্যের মধ্যে পদাণুর বহুমাত্রিক ব্যবহার দিয়ে বাংলা কাব্যকে স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে ভাষাবিদ ও বৈয়াকরণদের আগ্রহ তেমন একটা চোখে পড়ে না। বাংলা কাব্যভাষার এই উপাদানটি তো বটেই সামগ্রিক অর্থে বাংলা কাব্যভাষা নিয়েও তাঁদের আগ্রহ কম। বর্তমান আলোচনা সেই অভাব পূরণের একটি প্রয়াস মাত্র।

তথ্য-নির্দেশ

ইসলাম, রফিকুল ও অন্যান্য (সম্পা.)। (২০১২)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৯৪৫)। *সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*। বেঙ্গল পাবলিশার্স: কলকাতা।

টমসন, হানা রুথ। (২০২১)। *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ*। (স্বরোচিষ সরকার অনু.)। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১০)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। প্রথম-অষ্টাদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী: কলকাতা।

রায়, রামমোহন। (১৮৪৫)। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ।* কলিকাতা স্কুল বুক অব সোসাইটি: কলকাতা।

শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ। (১৯৩৫)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। প্রভেন্সিয়াল লাইব্রেরি: ঢাকা।

সরকার, স্বরোচিষ। (২০২১)। *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা*। কথা প্রকাশ: ঢাকা।

সরকার, স্বরোচিষ ও অন্যান্য। (২০২০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি*। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড: ঢাকা।

Zwicky, A. M. (1990). What Are We Talking About When We Talk About Serial Verbs? *OSU Working Papers in Linguistics*. Vol. 39, 1-13.

আনিসুজ্জামান ও বাংলা ভাষাচর্চা

শ্যামল কান্তি দত্ত *

Abstract: Dr. Anisuzzaman, a learned professor and researcher of Bangla language and literature, is anointed with a Bangla term 'The Lighthouse of Consciousness'. Beside teaching and research, this scholar stood in the front row of every crisis and struggle of Bangalees throughout his life and kept the honor of Bangla culture bright. Young Anisuzzaman, a college student then, wrote the first book on language movement in 1952. In addition to being an active participator of the language movement of 1952, this language activist has been vocal in protesting the ban on Rabindra Sangeet in East Pakistan. During the Liberation War, he made an important contribution as a member of the Planning Commission of the Expatriate Government, and his role in writing the Bengali commentary on the Constitution of Bangladesh is also highly recognized. He was a member of the country's first education commission, and was the first researcher who won research scholarship of Bangla Academy. He is also the first reader of commemorative essay on Amar Ekushey organized by Bangla Academy. He was the president of the Committee for Formulation of Standard Bangla Spelling Rules prepared by Bangladesh Textbook Board and Bangla Academy. He is also the advisor of Bangla Academy Standard Bangla Grammar Formulation Committee. Though he had such an important position in planning the position and shape of the Bangla

* Dr. Shamal kanty Datta, Associate Professor, Department of Bengali, Chittagong Urea Fertilizer College, Chittagong.

language, he could not be satisfied with the language situation in Bangladesh. However, he was not disappointed either. He was optimistic, "If we consciously stay with the Bangla language, formulate a language plan and language policy, then Bangla will overcome all obstacles with its own strength." Study and practice of his perception, thought, and analysis of the Bangla language are still vital today. Because the way shown by him in these matters can overcome the limitations of the use of Bangla at all levels in Bangladesh. Therefore, the aim of this article is to evaluate Anisuzzaman's overall practice, activities, and opinions related to Bangla language.

মূলশব্দ (Keywords): প্রমিতায়ন, বাঙালি-সংস্কৃতি, মান বাংলা, গদ্যভাষা, মিশ্রভাষা, ভাষানীতি ও ভাষাপরিকল্পনা।

ভূমিকা

বাঙালি মনীষার উজ্জ্বল প্রতিনিধি, বাঙালি জাতির শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭–২০২০)। বাঙালি যখনই জাতীয় কোনো সংকটে নিপতিত হয়েছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কলম হাতে পত্রিকার পাতায় হাজির হয়েছেন সাহসী ভূমিকায়। মুক্তবুদ্ধি ও মাঙ্গলিক চেতনার অনুপ্রেরণায় আজীবন পরিচালিত হয়েছেন আনিসুজ্জামান। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চাকে বিশ্বজনীন রূপ দানের ক্ষেত্রে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি হয়ে উঠেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। মেধা, অধ্যবসায় ও সাধনায় তিনি খ্যাতির শীর্ষ স্পর্শ করেছিলেন। কিন্তু ছিলেন এসবেরও অধিক। বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামেই কেবল নয়, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রতিবাদেরও প্রতীক হয়ে উঠেন তিনি। আর অনায়াসে অর্জন করেন বিশ্ব বাঙালির একজন অপরিহার্য অভিভাবককের আসন। অন্যদিকে, বাংলাদেশে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রমিত বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম আনিসুজ্জামান। কী বিশালই না ছিল তাঁর বিচরণক্ষেত্র! কী বিচিত্র ছিল তাঁর গবেষণা-সম্পাদনার বিষয়। বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণের আলোচনা হলেও বাংলা ভাষাচর্চা নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা-ভাবনা আমাদের আলোচনায় সচরাচর চোখে পড়ে না। অথচ বাঙালি সংস্কৃতি বলি আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলি–সেতো বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত। উনিশশো বায়ান্ন থেকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও বাংলা ভাষাকে যখন-ই বিকৃত-

সংকুচিত বা খণ্ডিত করবার অপপ্রয়াস শুরু হয়েছে, আনিসুজ্জামান তাঁর প্রতিবাদ করেছেন, মান বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত তৈরি করেছেন, প্রমিত বাংলা ভাষা প্রচলনে-পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ কমিটির নেতৃত্ব দিয়েছেন।

গবেষণা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা বাদ দিয়ে শুধু গবেষণায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আনিসুজ্জামানের অবদান সম্পর্কে একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা সম্ভব। গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও সিদ্ধি শিখরস্পর্শী। উচ্চাঙ্গের গবেষণা তাঁকে অবশ্যই বাংলাবিদ্যার বাইরেও পরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত করে তুলেছিল (সরকার, ২০২১: ৩৫)। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম লেখকদের অবদানের ক্ষেত্রে সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের এক ধরনের ঔদাসীন্য ছিল। এ ক্ষেত্রে আহমদ শরীফ মধ্যযুগের মুসলিম লেখকদের অবদানকে আমাদের সামনে আনেন, আর আনিসুজ্জামান ইংরেজ-শাসনামলের মুসলিম লেখকদের সাহিত্যচর্চার ওপরে যে গবেষণা করেছেন, সেটা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার যে দুর্বলতা ছিল, তা পূরণে সাহায্য করেছে। তিনি প্রমাণ করেন যে, পাঠান আমলে মুসলমান শাসকেরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যে উন্নতি-সাধন করেছিলেন, মুঘল শাসনকালে তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ইংরেজ শাসনামলে রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তনে (১৮৩৭) অভিজাত মুসলমানের জীবনে সংকট সৃষ্টি হয়। তবে কেবল সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই বাংলাভাষা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (আনিসুজ্জামান, ২০০১: ৩০৩)। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রমুখ বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভাষা ব্যবহার লক্ষ করে আনিসুজ্জামান আমাদের জানান যে, মিশ্ররীতির ভাষার প্রতি তাঁদের তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি প্রমাণ করে দেখান, 'ভাষার দিক দিয়ে একালের হিন্দু ও মুসলমান লেখকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না (আনিসুজ্জামান, ২০০১: ৩০৩)। তাঁর পিএইচডির (১৯৬২) গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)'। দুবছর পর এ সন্দর্ভ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪) নামে। গ্রন্থটি প্রকাশের পর আহমদ শরীফ লেখেন, 'সাম্প্রতিককালে যে-কয়টি বাংলা বই বের হয়েছে, সেসবের মধ্যে ড. আনিসুজ্জামানের *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৯৬৪) শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। এ এমন একটি বই, যা একবার পড়ে ফেলে রাখবার মতো নয়, বারবার পড়ার প্রয়োজন এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে এবং চিন্তার উদ্দীপন হয়' (শরীফ, ২০২০: ১৮১)। আরেক

অধ্যাপকের সাম্প্রতিক মন্তব্য, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ মুসলিম লেখকদের অবদানকে উপেক্ষা করে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন, আনিসুজ্জামানের এ গ্রন্থ তা অপনোদনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে' (আলীম, ২০২১: ৯০)। তবে এটা তাঁর প্রাথমিক গবেষণা। এর পরে ১৯৬৪ সালে তিনি পোস্ট ডক্টরাল থিসিসের জন্য ফুলব্রাইট স্কলারশিপে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে ইয়ং বেঙ্গলদের ভূমিকা'। এ পর্বে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (১৯৬৯)। এ গ্রন্থে উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চার ও সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কোম্পানি আমলের বাংলা গদ্যের নমুনা লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসের সংগ্রহশালা থেকে সংগ্রহ করে সেগুলো গবেষণার মাধ্যমে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেটা তাঁর গবেষণামনস্কতা ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন (চৌধুরী, ২০২০)। পুরোনো বাংলা গদ্য সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের গবেষণা বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায় সঞ্চার করেছে অনেক নতুন মাত্রা। *পুরোনো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪) বলতে বোঝানো হয়েছে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা গদ্য লেখা ইংরেজ আমলে শুরু হয়নি; বরং ষোল শতক থেকেই বাঙালি বাংলা ভাষায় গদ্য লিখেছেন– বৈষ্ণব নিবন্ধের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি তার প্রমাণ।

সম্পাদনা

সম্পাদনার ক্ষেত্রে আনিসুজ্জামানের গৌরবজনক কাজ *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬৮) শীর্ষক গ্রন্থ। রবীন্দ্রবর্জনের সেই স্বৈরবৃত্তকালে *রবীন্দ্রনাথ* প্রকাশ ছিল রীতিমতো এক বিদ্রোহ (ঘোষ, ২০২০)। বলা যায়, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি-প্রীতি ছিল তাঁর বিদ্রোহের প্রেরণা। ভাষানীতি প্রণয়নের অনুকূল পরিবেশ না পেলেও বাংলা ভাষার অবয়ব পরিকল্পনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মশালা (১৯৮৮) ও বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (১৯৯২) প্রণয়নে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তাঁর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৮৭)। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি দেখান যে, *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* চর্যাগীতির একমাত্র সংকলন নয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতেও এর ধারাবাহিকতা ছিল (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৭: ৩৭৮)। চর্যাপদ থেকে শুরু করে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ রচনা অবলম্বনে বাংলা ভাষার শ্রুতিরূপ ও কালপরিক্রমায় বাংলা ভাষার বিবর্তন চিহ্নিত করে নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫–১৯৯৮) 'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার' নামে যে-তেরোটি ক্যাসেট প্রকাশ করেন, আনিসুজ্জামান ছিলেন তার নির্দেশক। গুরুত্বপূর্ণ এ ক্যাসেটমালার

জন্য যৌথভাবে তাঁরা ভারতের 'আনন্দপুরস্কার' (১৯৯৪) লাভ করেন (মনজুর ও উদ্দিন, ২০২২: ১৫০)। প্যারিসের বিবলিওথেক নাসিওনালে গচ্ছিত পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধান করে আনিসুজ্জামান ও ফ্রাঁস ভট্টাচার্য মিলে সম্পাদনা করেন *ওগুস্তেঁ ওসাঁর বাংলা-ফরাসি শব্দকোষ* (২০০৩)। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত এই পাণ্ডুলিপি বাংলা-ফরাসি শব্দের সর্বপ্রথম সংগ্রহ। দেশের আইনাঙ্গনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার সগৌরব ব্যবহারের যে স্বপ্ন আজও আমাদের সামনে, সংবিধানের অনবদ্য বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে সে স্বপ্নের ঊষাকালীন অন্যতম সারথি ছিলেন আনিসুজ্জামান। তিনি যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন, 'আদালতের ভাষা রূপে বাংলার এই অবস্থার মূলে কাজ করছে ভাষা ব্যবহারে ব্যক্তির অনভিজ্ঞতা, সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ভাষানীতির অভাব এবং অনেক সময় আইনি পারিভাষিক শব্দাবলির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা' (আনিসুজ্জামান ও রহমান, ২০০৬: ১৩) অনিশ্চয়তা অপসারণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে আনিসুজ্জামান ও মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মিলে সংকলন-সম্পাদনা করেন *আইন-শব্দকোষ* (২০০৬)। প্রায় ৬০০০ ভুক্তির এই গ্রন্থের ভূমিকায় উঠে এসেছে আনিসুজ্জামানের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস, 'দেশের আইন ও সংবিধান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও উপলব্ধি মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত না হইলে দেশের প্রশাসনে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে না এবং আইনের শাসনের আলোকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে না' (আনিসুজ্জামান ও রহমান, ২০০৬: ১৫) এইভাবে বাংলাদেশের অনেক বাস্তব সমস্যার মূলে যে ভাষানীতির অভাব, তা আনিসুজ্জামান বার বার বলেছেন। দুই বাংলার ভাষা-বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে রচিত *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (২০১১) প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন আনিসুজ্জামান ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতির অভিধানসহ যেকোন প্রকল্পে তাঁর অবদান ছিল সীমাহীন। আমৃত্যু তিনি সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক বাংলা মাসিকপত্র *কালি ও কলম*-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভাষা বিষয়ক তৎপরতা

উনিশশো বায়ান্নোর ২৬শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন যখন ঘোষণা করলেন, 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' তখনই এর প্রতিবাদে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। জানুয়ারিতে গঠিত হলো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ঠিক হলো ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। ঠাটারিবাজারে তাঁদের বাড়ির

কাছে যোগীনগরে যুবলীগের অফিস। যুবলীগের সম্পাদক অলি আহাদের কাছ থেকে পুস্তিকা লেখার প্রস্তাব পেলেন যুবলীগের দপ্তর-সম্পাদক আনিসুজ্জামান। সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা, ভাষার প্রতি আকর্ষণ এসব মিলিয়ে তাঁর মনের ভেতর ভাষা আন্দোলনের চেতনাটি জন্ম নিল – তা নিয়ে রচনা করলেন ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বিষয়ে প্রথম পুস্তিকাটি। পুস্তিকাটির নাম দেওয়া হলো 'রাষ্ট্রভাষা কী ও কেন?'। অবশ্য পুস্তিকার নাম আনিসুজ্জামানের সাক্ষাৎকারসূত্রে আছে 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কি ও কেন?' (আলীম, ২০২০: ৯৯) দুর্ভাগ্য, পুস্তিকাটি বর্তমানে পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি সেদিনের কিশোর আনিসুজ্জামান মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে লিখেছিলেন। পনেরো বছরের এক কিশোর পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সেদিন নিজের হস্তাক্ষর ছাপতে দিয়ে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন (ঘোষ, ২০২০)। সে সাহস বাংলা ভাষার প্রতি প্রেম থেকে জাত।

মাতৃভাষাপ্রীতি থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সে সময়ে বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও শিক্ষক ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমির প্রথম গবেষণা বৃত্তি পেলেন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক শূন্যতায় বাংলা একাডেমির বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন (১৯৫৯)। তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা বৃত্তি পেলেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিএইচডি পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর পিএইচডির গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আব্দুল হাই। তবে তার আগে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৬৪-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের জাতীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে রেডিও-টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস করতে বলা হয়েছে। এটা ছিল প্রকারান্তরে রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ করবার এবং বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবার একটা পাঁয়তারা। এর প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিবৃতিতে আনিসুজ্জামান স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং সেটা বিভিন্ন কাগজে প্রকাশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের

বক্তৃতা লেখার কাজে যুক্ত ছিলেন। কখনও তিনি আগে বাংলা বক্তৃতা লিখতেন এবং সেটির ইংরেজি অনুবাদ করতেন খান সরওয়ার মুরশিদ, আবার কখনও মুরশিদ সাহেব আগে ইংরেজি ভাষ্য তৈরি করতেন, পরে সেটির বাংলাটা করতেন আনিসুজ্জামান। অবশ্য আনিসুজ্জামানের অমর কীর্তির মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা অনুবাদ অন্যতম। সংবিধানের মূল খসড়া লেখা হয় ইংরেজিতে। পাশাপাশি সংবিধানের বাংলা পাঠ তৈরির প্রয়োজন দেখা দিলে ড. আনিসুজ্জামানকে সংবিধানের বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া শাসনতন্ত্র কমিটির সদস্য না হয়েও তিনি খসড়া সংবিধান বিষয়ে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে/বিতর্কে উপস্থিত থাকার সুযোগ পান (শাহজাহান, ২০২০)। অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন যথার্থই বলেন, 'বাংলা ভাষার উপর দখল থাকার ব্যাপার না, পুরো বাংলাদেশের স্পিরিটটা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংবিধানে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের তাৎপর্য, উৎপত্তি বোঝার মত যে ক্ষমতা থাকা দরকার সেটার অভাব মেটাতে পেরেছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান' (হোসেন, ২০২০)। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশে একটি বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ড. কুদরতে খোদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, আনিসুজ্জামান ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯৭২-এ সদ্যস্বাধীন দেশেও আনিসুজ্জামানের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা যায়নি। এমনকি সেসময় মন্ত্রিসভা ঢাকায় এসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরিকল্পনা-কমিশনের কোনো নথিপত্র আর পাওয়া যায়নি (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৭: ১৪৫)। দেশে আজও প্রণীত হয়নি কোনো ভাষানীতি।

ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা আধুনিককালে সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা ভাষাপরিকল্পনা। সমাজ-জীবনে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিশৃঙ্খলা দূর করবার প্রয়াস থেকেই কোনো একটি ভাষাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভাষাপরিকল্পনা করতে গেলে সবার আগে আবশ্যিক একটি সুস্পষ্ট ভাষানীতি। কেননা, ভাষানীতি ব্যতিরেকে ভাষা পরিকল্পনা অসার হতে বাধ্য। ভাষানীতি মূখ্যত একটি সামাজিক নির্মিতি। তবে ভাষানীতি জন্ম নেয় ভাষাবিদ্যা যখন রাজনীতির মুখোমুখি হয়। ১৯৪৭ এর দেশ-বিভাগ বাংলা ভাষানীতি প্রণয়নে যে দ্বিধার জন্ম দিয়েছে, দুই বাংলার কোথাও তা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সবার জানা ইতিহাস পৃথিবীর প্রথম সার্থক ভাষাপরিকল্পনা প্রয়াস হয় ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পাণিনির হাতে। অথচ বিশ শতকে এসেও এই বাংলা ভাষার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান (ঢাকা, ১৯৫২) ও ভারতে (আসাম, ১৯৬১) বাঙালিকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তারপর সামান্য কিছু অর্জন থাকলেও আজ অবধি এতদ্অঞ্চলের

কোথাও প্রণীত হয়নি কোনো ভাষানীতি; গৃহীত হয়নি কোনো ভাষাপরিকল্পনা। ভাষানীতির অভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করাই সাধু ভাষায় আর পরীক্ষা নিই চলিত ভাষায়। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি পড়াই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে। অথচ ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা, না বিদেশি ভাষা; সে সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি। অন্যদিকে ভাষানীতির ভিত্তিতে প্রণীত ভাষা-পরিকল্পনার আছে দুটি শাখা: অবস্থান-পরিকল্পনা এবং অবয়ব-পরিকল্পনা। অবয়ব-পরিকল্পনার নমুনা বানান, লিপি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামান্য কিছু কাজ আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে সম্পাদিত হয়েছে। তবে অবস্থান পরিকল্পনা অর্থাৎ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায়, অফিস-আদালতে, কর্মী নিয়োগ-পরীক্ষায় বাংলা ভাষার অবস্থান কোন স্তরে থাকবে তার পরিকল্পনা প্রণয়নে আজও আমরা পিছিয়ে আছি। অবশ্য বিষয়টি বিশেষজ্ঞর নয়, বরং রাজনৈতিক দলের নেতার। তবে ভাষাচর্চার রূপ বা অবয়ব কেমন হবে তা নিয়ে আনিসুজ্জামান সক্রিয় সংগ্রামে সচেতন-সচেষ্ট থেকেছেন।

বাংলা গদ্যভাষায় আনিসুজ্জামানের অবদান অপরিসীম। পাককালচারপন্থিদের অপকৃষ্ট চিন্তাধারা বাংলা গদ্যকে বটতলার পুথির দরবারে নেয়ার অপপ্রয়াস দেখে–তাঁর প্রিয় শিক্ষক মুনীর চৌধুরী এক প্রবন্ধে বলেন, 'মাতৃভূমি মানে মামার বাড়ি নয়, মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা বা গাঁয়ের ভাষা নয়।' বাঙালি মহৎ মনীষীদের হৃদয়ের উৎস থেকে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ঘটেছে–একথা সবার আগে অনুধাবন করেন আনিসুজ্জামান। অষ্টাদশ শতকের নথিপত্র ঘেঁটে তিনি দেখিয়েছেন–আমাদের যেমনটি ধারণা, ইংরেজ আসার পর মিশনারিরাই বাংলা গদ্যের প্রচলন করেছিল – সে ধারণা ভ্রান্ত (দত্ত, ২০২১: ১৯৯)। বাংলা গদ্যের ধারাবাহিকতায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাহিত্যিক বাংলা গদ্যভাষার যে উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে, আনিসুজ্জামান সেই ধারাবাহিকতার সার্থক সারথি। আনিসুজ্জামানের ছাত্রের ভাষায়, 'এমএ-তে (১৯৬৫-৬৬) অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাদের পড়াতেন প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ ... প্রমথ চৌধুরীর অসাধারণ গদ্যরীতি, সাহিত্য, সভ্যতা, পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক, সাধু ও চলিত ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি বিশ্লেষণমূলক ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে আলোচনা করেছেন' (হক, ২০২০)। আনিসুজ্জামান অনূদিত সংবিধানের ভাষা সাধু বাংলা হলেও তিনি সচরাচর চলিত রীতিতেই লিখেছেন–প্রমিত বাংলার প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেছেন। বাংলাদেশের বাংলা ভাষার প্রমিতায়নে তিনি খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন (আজম, ২০২০)। কেননা তাঁর জ্ঞানসাধনার একটি দিক ছিল বাঙালিকেন্দ্রিক। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, বাঙালির বাঙালি হয়ে ওঠা এবং কিছু বাঙালির বাঙালিয়ানাকে অস্বীকার করে–এবং অন্য কোনো পরিচয়কে সার্বিকভাবে

ধারণ করতে না পেরে নিরালম্ব হয়ে পড়ার বিষয়টি (ইসলাম, ২০২১: ২২৭)। এই নিরালম্ব লোকেরাই ঠাহর করতে পারে না–আমাদের জাতীয়তা বা ন্যাশনেলিটি বাঙালি আর নাগরিকতা বা সিটিজেনশিপ বাংলাদেশি। বাংলা ভাষাচর্চার প্রসারের মাধ্যমেই এই অসারতার অবসান সম্ভব।

ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি করেছেন ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা একাডেমি বক্তৃতামালার প্রথম বক্তারূপে আহূত হয়ে তিনি ১৬, ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারিতে তিনটি লিখিত বক্তৃতা দিয়েছেন (আজম, ২০২০)। আনিসুজ্জামানের বক্তৃতার ভাষাশৈলী ও পরিমিতিবোধ সম্পর্কে বাঙালি নন্দনতাত্ত্বিক যথার্থই লিখেছেন, 'এত সুন্দর করে গুছিয়ে এবং রসবোধের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, মনে হতো বাংলা ভাষার যে শক্তিটা আমরা ভুলে গেছি, তা তিনি দুই মিনিটেই জাগিয়ে দিতেন (ইসলাম, ২০২০: ৬)।' ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমিতে 'অমর একুশে বক্তৃতা' প্রদান করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান অসীম সাহসিকতার সাথে স্বৈরাচারি সামরিক সরকারের আমলা-বুদ্ধিজীবীগণের সামনে প্রশ্ন রাখেন, 'বাংলাদেশে, আমাদের স্বাধীন মাতৃভূমিতে, প্রার্থিত আসনে কি অধিষ্ঠিত হতে পারবে মাতৃভাষা?' (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯: ৫০)। তার চল্লিশ বছর পরেও সে-প্রশ্ন আজও আমাদের মনে ঘুরপাক খায়। অথচ সেদিন তিনি আমাদের সতর্ক করেছিলেন–দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ১৯৭১-এ রাষ্ট্রের যে মূলনীতি নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, 'তেরো বছর পর এর একটিও আর অক্ষুণ্ন নেই। ... বাংলাদেশ নামটা আছে, কিন্তু এ কোন বাংলাদেশ? বাংলাদেশ নামটা থাকবে। কিন্তু তা বাংলাদেশ হবে না ক্ষুদ্রতর পাকিস্তানে পরিণত হবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ আমরা কতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, তার ওপর। বাংলাদেশ হবে কিনা, তা নির্ভর করবে জীবনের সকল স্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ কতোখানি সফল হচ্ছে, তার ওপর (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯: ৫৭)।' মাতৃভাষার প্রয়োগে আমাদের ব্যর্থতার কারণ বা ত্রুটি যে বাংলা ভাষার নয়–আমাদের আয়োজনের–সেই ইতিহাসও তিনি বিশ্লেষণ করেন এই প্রবন্ধে। শেষে স্মরণ করেন যে আমাদের কর্তব্য জীবনের সকল স্তরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত করা। সে দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়ে ঐ প্রবন্ধ পাঠ শেষ করবার পরে আরও প্রায় তিন যুগ সক্রিয় ছিলেন আনিসুজ্জামান। আমাদের আফসোস আজও আমরা অঙ্গীকার করি, কিন্তু কাজে অবতীর্ণ হতে পারছি কি !

সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলন দূরের কথা আজও আমরা দেশের সবাইকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পেরেছি কি না ভাবতে হবে। কেননা, আনিসুজ্জামানের ভাষায়, 'আমাদের ভাষাশিক্ষার পদ্ধতিও নেহাত ত্রুটিপূর্ণ'। আমাদের দেশে ধর্মীয়

ভাষায় শিক্ষাগ্রহণকারীরা ইহজাতিকতা বিমুখ হচ্ছে। অন্যদিকে, 'স্বাধীনতার কল্যাণে ততদিনে বাঙালি মধ্যবিত্তের কিঞ্চিৎ ধনাগম হয়েছে। ... তাদের অধিকাংশের চোখে স্বপ্ন পাশ্চাত্য জগতে স্থিতিলাভ করার, মন্ত্র অনেকটা 'আমার এই দেশেতে জন্ম যেন ওই দেশেতে মরি'। এদিকে বাংলা বিদ্যালয়গুলো ক্রমশ হতশ্রী হয়ে পড়ছে (আনিসুজ্জামান, ২০১৫: ২৮৯)।' আমরা কেউ আরবি বা ইংরেজি ভাষার প্রতি বিদ্বষ্ট নই। তবু আনিসুজ্জামান আমাদের সতর্ক করেন, 'দ্বিতীয় ভাষা কখনো প্রথম ভাষার স্থান নিতে পারে না। এই বিষয়ে সচেতন না হলে সমগ্র জাতির জন্য আমরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব, যখন 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'–এই বিধান অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে (আনিসুজ্জামান, ২০১৫: ২৮৯)।' এই সচেতনতা সৃষ্টির সংগ্রামে আনিসুজ্জামান আজও আমাদের সাথী-পথপ্রদর্শক। তাঁর আক্ষেপ-আশাবাদ দুইই আমাদের ভাবতে হবে। মৃত্যুর দু'যুগ আগে তিনি লিখেন, 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রে একটা ভাষানীতি থাকলে ভালো হত, সেটা ধরে অগ্রসর হওয়া যেত। সেই সঙ্গে এও আশা করব যে, বাংলা ভাষা শিক্ষায় আমরা যত্নবান হব (আনিসুজ্জামান, ২০১৫: ২৯৭)।' বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় এ অসম্ভব বা স্বপ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু আরও বৈরি রাজনৈতিক পরিবেশে আনিসুজ্জামান বাঙালি সংস্কৃতির জন্য, বাংলা ভাষার জন্য লড়েছেন। জ্ঞানচর্চার নামে পাশ্চাত্য-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে এদেশের বুদ্ধিজীবী-গবেষকদের পথ দেখিয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাই আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাঁর ভূমিকা আমরা দেখেছি (রহমান, ২০২১: ২১৫)।

গত শতকের ষাটের দশক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন আনিসুজ্জামান। এর প্রধান কারণ তিনটি। প্রথমত, তিনি একজন পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল ছিলেন। দ্বিতীয়ত, গবেষণা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তৃতীয় একটা বিষয় ছিল, সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়া। আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি যে কাজটা করেছেন, একেবারেই বৈপ্লবিক কাজ (ইসলাম, ২০২০)। সেই বিপ্লব, সেই সংগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশেও সেক্যুলারিজম বিদ্বেষী লেখকদের বিরুদ্ধে আনিসুজ্জামানকে অবিরাম চালাতে হয়েছে। কেননা ঐ লেখকগণ মনে করেন, ভারতের বাংলা ও বাংলাদেশের বাংলা আলাদা হওয়া উচিত। প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষাকে স্থাপন করেছেন একান্তই পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে। এই প্রমিত ভাষা পূর্ব বাংলার মৌখিক ভাষা থেকে অনেকখানি পৃথক। সুতরাং তাঁদের পক্ষে তা মান্য করা আবশ্যক নয়। আনিসুজ্জামান ঐ লেখকগণের ভাষার উদ্ধৃতি দিয়ে এর অসারতা তুলে ধরেন আর

মন্তব্য করেন, 'লেখকমাত্রেরই অধিকার আছে নিজের ভাষা খুঁজে নেওয়ার। তার ফল ভালো হোক, মন্দ হোক, আমরা তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী লেখকদের যুক্তির জের টেনে কেউ যদি কখনো বলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষা আমার ভাষা নয়, তাহলে আমাদের অনেক দুঃখ পাওয়ার কারণ ঘটবে (আনিসুজ্জামান, ২০১৫: ২৯৪)।' এঁদের এই স্বাতন্ত্র্যচিন্তা যে বাংলা ভাষাকে আরও সংকুচিত করবে, খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করবে সে বিপদের কথা আনিসুজ্জামান আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'যদি বাংলা ভাষার ঐক্যের কথা ভুলে যাই, তাহলে কিন্তু পাকিস্তান আমলের ফাঁদে আবার পড়ব, আমাদের এই ভূখণ্ডে যে-ভাষা এটিই আমাদের, এর বাইরে যেটা সেটি আমাদের নয়। তখন তুমি বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করবে, বাংলা সাহিত্যকে করবে এবং বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে করবে। এই বিপদ থাকবে (আনিসুজ্জামান, ২০১১)।' সে-বিপদ আমাদের পিছু ছাড়ছে না, উপরন্তু অধুনা আরেকটি বিপদ যোগ হয়েছে বিদেশি ভাষার ঢঙে বাংলা বলার প্রবণতা। এ প্রসঙ্গে সচেতন ছিলেন আনিসুজ্জামান, এক সাক্ষাৎকারে তাই তিনি বলেন, এ প্রজন্মের অনেকেই এখন 'অসাধারণ' না বলে বলেন 'অ'সাম'। 'খুব সুন্দর' না বলে বলেন 'জোশ', 'খুব ভালো' না বলে বলেন 'হেব্বি'। বাংলা ভাষা এত রক্ষণশীল নয় যে, তাতে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু যে শব্দ বাংলায় আছে সেটাকে উপেক্ষা করে তার পরিবর্তে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলে সেটা নিয়ে আপত্তি উঠাই স্বাভাবিক (আনিসুজ্জামান, ২০১৮)। আনিসুজ্জামান সমাজমনস্ক ছিলেন বলেই বাংলা ভাষার সামাজিক অবস্থান তাঁর নজর এড়ায়নি। সমাজের যে প্রবাহ, সেটি তিনি লক্ষ করতেন। প্রতিক্রিয়াশীলতাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন এবং এর বিরুদ্ধে তাঁর যে অবস্থান সেটি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে তিনি কখনোই আপস করেননি। আর দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা যাবে উদারনৈতিক (চৌধুরী, ২০২০)। উদারদৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি দেখেছেন, বাংলা ভাষা বর্তমানে যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এ থেকে বের হওয়ার উপায় হচ্ছে বাংলা ভাষার চর্চা বাড়ানো। এ জন্য বিশ্বায়নের যুগে তিনি চেয়েছেন বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন।

উপসংহার

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন, বাঙালির সত্য ও নির্ভরতার অজেয় প্রতীক; প্রচলিত নষ্ট মত ও পথের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী সকল বাঙালির অগ্রগামী চেতনার আলোকবর্তিকা। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আবার বাংলা ভাষা চর্চার সার্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরিতে বাংলা একাডেমিতে তাঁর

কাজের কোনো তুলনা নেই–একথা বলা যায় নির্দ্বিধায় (রহমান, ২০২১: ২১৬)। কায়মনে বাঙালি হয়ে তিনি বিশ্ব বাঙালির চরিত্রে যেমন রূপ ধারণ করেছিলেন, তেমনি, অন্যদের ইতিবাচক রূপান্তরেও ছিলেন অনিঃশেষ প্রেরণা (খান, ২০২০)। বাংলা ভাষার অবস্থান পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশের একটি ভাষানীতির স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, দেখিয়েছেন। স্বপ্ন বাস্তবায়ন দেখে যেতে না পারলেও, কোথায় বাংলা ভাষার শক্তি আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, শনাক্ত করেছেন বাংলা ভাষার শত্রুকে। এটা অনুসরণ করতে পারলে আনিসুজ্জামানের অভাবটা অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব, সম্ভব স্বাধীন দেশে একটি ভাষানীতি প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে বাংলা ভাষার অবস্থান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। বাংলা ভাষা-শিক্ষার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সংগ্রাম, বাংলা ভাষাকে ইংরেজি-হিন্দির আধিপত্য থেকে মুক্তির সংগ্রাম আজও অবিরাম। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন ও বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ কর্মী ও সমর্থক তাঁর দীপ্র চেতনায় আলোকিত। বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সবার হৃদয়ে অফুরন্ত প্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকবেন।

তথ্য-নির্দেশ

আনিসুজ্জামান। (সম্পা.)। (১৯৮৭)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। (প্রথম খণ্ড)। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

আনিসুজ্জামান। (১৯৯৭)। *আমার একাত্তর*। সাহিত্য প্রকাশ: ঢাকা।

আনিসুজ্জামান। (১৯৯৯)। *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*। আগামী প্রকাশনী: ঢাকা।

আনিসুজ্জামান। (২০০১)। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*। প্যাপিরাস: ঢাকা।

আনিসুজ্জামান। (২০১৫)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। কথাপ্রকাশ: ঢাকা।

আনিসুজ্জামান ও রহমান, মু. হা. (সং ও সম্পা.)। (২০০৬)। *আইন-শব্দকোষ*। অন্য প্রকাশ: ঢাকা।

আলীম, এম আব্দুল। (২০২০)। *ভাষা আন্দোলন-কোষ*। প্রথম খণ্ড। সাহিত্যপ্রকাশ: ঢাকা।

আলীম, এম আব্দুল। (২০২১)। *আনিসুজ্জামান*। স্টুডেন্ট ওয়েজ: ঢাকা।

ইসলাম, সৈ. ম. (২০২১)। মৃত্যুহীন প্রাণ: অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। আবুল হাসনাত (সম্পা.), *আনিসুজ্জামান স্মরণ*। বেঙ্গল পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

দত্ত, দে. (২০২১)। নিখাদ বাঙালি এবং বিশ্ব-নাগরিক আনিসুজ্জামান। আবুল হাসনাত (সম্পা.), আনিসুজ্জামান স্মরণ। বেঙ্গল পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

মনজুর, তা. ও উদ্দিন, জ.। (২০২২)। ভাষাচর্চা। সৈয়দ আজিজুল হক ও অন্যান্য (সম্পা.), *শতবর্ষে বাংলা বিভাগ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা।

রহমান, আ.। (২০২১)। জনগণের বুদ্ধিজীবী। আবুল হাসনাত (সম্পা.), আনিসুজ্জামান

স্মরণ। বেঙ্গল পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

শরীফ, আ.। (২০২০)। মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য: আমার দৃষ্টিভঙ্গি (পুনর্মুদ্রণ)। *উত্তরাধিকার* নতুন অভিযাত্রা ৭, আনিসুজ্জামান সংখ্যা. পৃ. ১৮১।

সরকার, পবিত্র। (২০২১)। আনিস ভাই। আবুল হাসনাত (সম্পা.), *আনিসুজ্জামান স্মরণ*। বেঙ্গল পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

আজম, মোহাম্মদ। (২০২০, মে ১৬)। সার্থক মানুষের প্রতিকৃতি। *প্রথম আলো* ।

আজম, মোহাম্মদ। (২০২০ ক, মে ১৭)। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান তাঁর গবেষণাকর্মের একদিক। *বণিক বার্তা*।

আনিসুজ্জামান। (২০১১, ফেব্রুয়ারি ২১)। আগে ভাষানীতি, তারপর দরকার ভাষা-পরিকল্পনা। *প্রথম আলো*।

আনিসুজ্জামান। (২০১৮, ফেব্রুয়ারি ২৭)। নিজের শক্তিতেই বাংলা ভাষা সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে যাবে। *একুশে টেলিভিশন*।

ইসলাম, সৈ. ম.। (২০২০, মে ১৫)। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? *দ্য ডেইলি স্টার*।

ইসলাম, সৈ. ম.। (২০২০ ক, মে ১৬)। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। *প্রথম আলো*।

খান, র.। (২০২০, মে ১৭)। চিরকালের আনিসুজ্জামান। *দৈনিক ইত্তেফাক সাময়িকী*।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। (২০২০, মে ১৫))। আনিসুজ্জামান: বাঙালির বাতিঘর। *প্রথম আলো*।

চৌধুরী, সি. ই.। (২০২০, মে ১৫)। তাঁর মতো আরেকজনকে আমরা পাব না। *প্রথম আলো*।

চৌধুরী, সি. ই.। (২০২০ ক, মে ১৬)। অসামান্য আনিসুজ্জামান। *কালের কণ্ঠ*।

শাহজাহান, মো.। (২০২০, মে ১৬)। ড. আনিসুজ্জামান ও বাংলাদেশের সংবিধান। *দৈনিক জনকণ্ঠ*।

হক, আ. কা. ফ.। (২০২০, ফেব্রুয়ারি ১৪)। আমাদের শিক্ষক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। *ভোরের কাগজ*।

হোসেন, সৈয়দ আকরম। (২০২০, মে ১৪)। আনিসুজ্জামান ছিলেন সমাজের চেতনার বাতিঘর। *বিবিসি বাংলা*।

তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জঃ সমাধানে কিছু প্রস্তাবনা

আতাউর রহমান সায়েম *

Abstract: Language is a form of social technology and the use of the Bangla language is integrated into every aspect of our daily lives. Making Bangla language technology-friendly is essential for building a Smart Bangladesh. Significant progress has been made in the use of Bangla in information technology (IT) to date. It is anticipated that as the use and application of Bangla in Information and Communication Technology (ICT) continue to grow, further transformative changes will emerge in the country's administrative, educational and communication systems. On the international stage, Bangla language can achieve its rightful recognition and excellence. In the field of research and development, the Bangla Language Enrichment Project in Information Technology outlines the development of over 40 software tools through 16 components tailored for Bangla. Once completed, this will elevate the use of Bangla on the global platform. In particular, the development of a comprehensive Bangla corpus and Bangla style-sheets will lay the foundation for world-class Bangla computing. This article identifies the challenges in the development and use of Bangla in information technology and proposes solutions to overcome these challenges.

* Ataur Rahman Sayem, Teacher (Bangla), Ideal School And College, Motijheel, Dhaka 1000 And PhD Researcher, Bangla Department, National University.

মূলশব্দ (Keywords): তথ্য-প্রযুক্তি, উপাংশ, ইউনিকোড, করপাস (ভাষাংশ), ওসিআর বর্ণ, পূর্ণ ফন্ট।

ভূমিকা

ভাষা নদীর স্রোতের মতো বহমান। প্রতিনিয়ত চলে ভাষার রূপ বদলের পালা। এ পরিবর্তনের ফলে ভাষা যেমন একদিকে উন্নত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টি হচ্ছে নানামাত্রিক সমস্যা ও জটিলতা। কোনো দেশে কিংবা সমাজে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা বিরাজিত থাকলে, এক ভাষা অন্য ভাষাকে প্রভাবিত করে। এই পরস্পর প্রভাবিতকরণের বিষয়টিকে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ভাষা-সংসর্গ' বলে অভিহিত করা হয় (করিম, ২০২২)। ভাষা-সংসর্গ সমস্যার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী চলছে প্রযুক্তির বিপ্লব। বর্তমানে স্কুলশিক্ষার্থী থেকে শুরু করে গ্রামের কৃষক পর্যন্ত সবার জীবন বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। দৃশ্যমান হচ্ছে সব স্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার। আরও পরিপূর্ণ সফলতা পেতে হলে মাতৃভাষাকেও তথ্য-প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্বে ইংরেজি ভাষা জানা মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু ইংরেজিকে প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ফলে এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। শুধু বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নয়, প্রযুক্তির মাধ্যমে মাতৃভাষায় যোগাযোগ মানুষের কাছে সহজ ও বোধগম্য হয় এবং তা সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও ব্যবহারে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকলেও তা সমাধানের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশকে উন্নত করার জন্য 'Action Plans for Smart Bangladesh ২০৪১' প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখন থেকেই 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের চেষ্টা করতে হবে (জামান ও রহমান, ২০২৪)।

তথ্যযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার

প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তিবিদরা কাজ করে যাচ্ছেন বিরামহীনভাবে। হরেক রকমের বাংলা অ্যাপস তৈরি করছেন প্রতিনিয়ত। বেসিসের (Bangladesh Association of Software and Information Services) তথ্য মতে, ২০১৯ সালে শুধু অ্যাপস নিয়ে কাজ করেছে প্রায় শ'খানেক আইটি প্রতিষ্ঠান। উল্লেখযোগ্য অ্যাপসের মধ্যে আছে 'একুশ আমার', 'ই-তথ্য কোষ', 'বাংলা ব্লগস', 'বাংলা এসএমএস', 'বাংলা অভিধান', 'বাংলাদেশের সংবিধান', 'বর্ণ শিক্ষার হাতেখড়ি', 'জি-শ্লেট বাংলা' ইত্যাদি। রয়েছে ধর্ম, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, বিনোদন, খবর ইত্যাদি বিষয়ে হাজার খানেক বাংলা অ্যাপস। বাংলা বানান ও ব্যাকরণ ঠিকভাবে লেখার জন্য

তৈরি হয়েছে অ্যাপস 'সঠিক'। এছাড়াও পাবলিক সেন্টিমেন্ট বিশ্লেষণের 'জনমত', বাংলা ওসিআর 'বর্ণ', বাংলা ফন্টের ইন্টার অপারেবিলিটি ইঞ্জিন, বাংলা মেশিন ট্রান্সলেটর উন্নয়ন, স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যারসহ আরও বেশ কয়েকটি জনগুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার তৈরির কাজ চলছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকার আগারগাঁও 'বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল' (বিসিসি)-অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের bangla.gov.bd ওয়েবসাইটে ৪টি সফটওয়্যার– ১. বর্ণ বাংলা OCR, ২. কথা (বাংলা স্পিচ টু টেক্সট), ৩. উচ্চারণ (বাংলা টেক্সট টু স্পিচ) এবং ৪. বাংলা পূর্ণাঙ্গ ফন্ট সফটওয়্যার উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করার জন্য উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে সেগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে। আবার ইউবোর্ড সব লিপি সব ভাষা সব লেআউট https://bangla.gov.bd/wp-content/uploads/2023/02/UBoard_TVC.mp4 ইউনিভার্সাল কি-বোর্ড সফটওয়্যার 'ইউবোর্ড' বাংলা ভাষা তথা দেশের সব ভাষার সব লিপির সব লেআউটের জন্য প্রথমবারের মতো একটি ইউনিভার্সাল কি-বোর্ড ডেভেলপ করা হয়েছে।

যার ফলে বাংলাসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলো কম্পিউটারে মান অনুসরণ করে নির্ভুলভাবে লেখা যাবে।

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ও মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রোবটের বোধগম্য করার প্রক্রিয়া অনেকটা সফল হয়েছে। রোবটটি বাংলা শব্দ ডানে যান, বামে যান, থামুন, এবার চলুন এসব আদেশ কেবল বুঝতেই পারে তা নয়; হুকুম তামিল করতেও খুব একটা সময় নেয় না। আবার যারা বাকপ্রতিবন্ধী বা কথা বলতে অক্ষম, তাদের জন্যও রোবটটিতে যোগ করা হয়েছে বিশেষ সংবেদনশীল ব্যবস্থা। এদিকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য 'ডিজিটাল টকিং বুক বা ডেইজি' নামের প্রযুক্তিনির্ভর ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্য-বই ও 'প্রযুক্তিতে দেখব দেশ' ব্রেইল মুদ্রাক্ষরে লিখিত সফটওয়্যার বের করেছে ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। গুগল প্লে স্টোরে 'বাংলা অ্যাপস' লিখে সার্চ করলেই মিলবে মায়ের ভাষার এসব নানান কাজের অ্যাপস, যেখানে আছে ১০ লাখেরও বেশি বাংলা শব্দ।

ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের সদস্য হওয়ায় ২০১৩ সাল থেকে যান্ত্রিক ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে আমাদের বাংলা বর্ণমালা। এর ফলে গুগল, টুইটার ইত্যাদি সার্চ ইঞ্জিনে যুক্ত হয়েছে বাংলা ভাষা। এখন অ্যান্ড্রয়েড থেকে শুরু

করে উইন্ডোজ, আইওএস, ফায়ারফক্স ইত্যাদিতে বাংলা লেখা যায় অনায়াসে। ইউনিকোড ও ইন্টারনেটের সুবাদে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপসহ অধিকাংশ ডিভাইসে এসেছে বাংলা ভাষার ছোঁয়া। দেশের তরুণ প্রযুক্তিপ্রেমীদের প্রচেষ্টায় ইউনিকোডে তৈরি 'অভ্র'র (ময়মনসিংহ মেডিক্যালের ছাত্র মেহেদী হাসান খানের উদ্ভাবিত) পাশাপাশি 'কালপুরুষ' (খুলনা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তানবীন ইসলাম সিয়ামের উদ্ভাবিত) ও 'সোলায়মান লিপি' (সোলায়মান করিমের উদ্ভাবিত) ইউনিকোড পাটাতনে তৈরি বলে মুদ্রণ ও অনলাইনে সমভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। এছাড়াও শাপলা, দোয়েল, নিকশ, নিকশবেন; এমনকি ইউনিবিজয় দিয়েও ইচ্ছামতো বাংলায় ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধান করা যাচ্ছে। একই সঙ্গে 'বাংলা ফন্ট কনভার্টার দিয়ে যে-কোনো ফন্টের লেখা সুবিধা মতো পরিবর্তন করা যায়। দেশে আমদানি করা প্রায় সব স্মার্টফোনেই 'বাংলা' বিল্টইন করা হয়েছে। সফটওয়্যার ছাড়াই ফেসবুক ও লিংকডইনে বাংলা লেখার সুযোগ করে দিয়েছে 'বাংলা ভাই' অ্যাপ। বাংলা ভাষায় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ 'চা স্ক্রিপ্ট' ও কালজয়ী সব ক্লাসিক বই সংবলিত 'বইপোকা' অ্যাপটির মাধ্যমে সব স্মার্ট ডিভাইসে বাংলা বই পড়া যায় (সরকার, ২০২২)।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাল থেকে ডিজিটাল আর্কাইভ 'বই চিত্র' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম অ্যাপ উন্মোচিত হয়েছে ঢাকার বইমেলায়। ডিজিটাল লাইব্রেরি ফরম্যাটে তৈরি অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস প্ল্যাটফর্মের এ অ্যাপটিতে টেক্সটের পাশাপাশি আছে অডিয়ো বুক। থাকছে বাংলা চলচ্চিত্রের ভিজুয়্যাল আর্কাইভও। অর্ধশত অডিও বইয়ের ভাণ্ডার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল অ্যাপটি। আইসিটি বিভাগের বাংলাভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিকগনাইজার (ওসিআর), টেক্সট টু স্পিসসহ ১৬টি টুলস তৈরি করা হচ্ছে (হক, ২০১৮)। সারা দেশে ৭১টি লাইব্রেরিকে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। একটি ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি করা হচ্ছে যেখানে মানুষ লাখ লাখ বই স্ব স্ব গ্রামে বসে সাবস্ক্রাইব করতে পারবে। ২০১২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে মোবাইল ফোনে বাংলায় 'ক্ষুদেবার্তা' বা এসএমএস চালু এবং সব ব্র্যান্ডের মোবাইল হ্যান্ডসেটে পূর্ণাঙ্গ বাংলা কি-প্যাড সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দেশের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন অফিসের সেবা মানুষের কাছে সহজে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলায় ২৫ হাজার ওয়েবপোর্টাল সক্রিয় আছে (সরকার, ২০২২)।

২০১৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলা ভাষার ওয়েবসাইটে গুগল অ্যাডসেন্স চালু করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সার্চ ইঞ্জিন গুগল। বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কিছু বিবেচনা করে বাংলায় গুগল অ্যাডসেন্স চালু করা হয়েছে। বাংলা অ্যাডসেন্স চালুর আগে গুগল নতুন ৩০টি ভাষা যোগ করেছে স্পিচ-টু-টেক্সটে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা ভাষাও। এতে গুগলের এ সুবিধাটি ব্যবহার করে বাংলায় উচ্চারণ করে টাইপ করা যায়। পাশাপাশি উচ্চারণ করেও গুগল সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু খোঁজা যায়।

বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ই-কমার্স। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই গড়ে উঠছে এক একজন উদ্যোক্তা। মেসেঞ্জার বট হতে পারে এসব উদ্যোক্তাদের এগিয়ে চলার এবং সফলতার পথে এক নতুন সূচনা। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে বাংলাভাষী বট তৈরি করেছে 'প্রেনিউর ল্যাব'। নাম দিয়েছে 'বাংলা বট'। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Inteligence) মেসেঞ্জার বটটি বাংলা ও ইংরেজি হরফে লেখা বাংলা বুঝতে এবং উত্তর দিতে সক্ষম। ChatGPT সফটওয়্যারেও বাংলা ফন্ট সুন্দরভাবে কাজ করছে।

ভাষা, বিশেষত শব্দ ও অর্থগত বুনিয়াদ মজবুত করার জন্য অভিধান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কম্পিউটার-নির্ভর তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশের ফলে অভিধানের ডিজিটাল রূপও তৈরি হয়ে গিয়েছে। সিডি, ডিভিডি ছাড়াও অভিধান ও বিশ্বকোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া) ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে। এক নিমেষেই এখন শব্দ, অর্থ, উৎপত্তি, সংজ্ঞার্থ ইত্যাদি জেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশেষ সফটওয়্যার/এপিকে ব্যবহার করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কাছেও আলো হয়ে ধরা দিচ্ছে 'অভিগম্য অভিধান'। এটি তৈরি করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় 'ইপসা' নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা ছাড়াও অনলাইনে ও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ পরিচালিত স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যায় এই 'অ্যাকসেসিবেল ডিকশনারি' (অভিগম্য অভিধান)। এ অভিধানটি (http://accessibility dictionary.gov.bd) ব্যবহার করে ইংরেজি ও বাংলা শব্দের উচ্চারণসহ অর্থ শুনতে পারছেন বিভিন্ন বয়সের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

এভাবে অনলাইনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। দেশের প্রায় ১২ কোটি মোবাইল ফোন, সাড়ে চার কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এখন বাংলা ব্যবহার করতে পারছেন। আর বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি লোক বর্তমানে বাংলায় কথা বলে। আরও কিছু সময় উপযোগী টুলস সংযুক্ত করার পাশাপাশি

মাতৃভাষায় ভালো কনটেন্ট ও মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হলে তা শুধু মানুষকে জ্ঞানার্জন, তথ্য ও সেবা পাওয়া নিশ্চিত করবে না, মাতৃভাষাকেও বাঙালির মাঝে চিরঞ্জীব করতে সহায়তা করবে।

তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প

তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের অগ্রগতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার 'তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধকরণ' নামের একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। ২০১৭ সালের ৩রা জানুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি 'একনেক' সভায় অনুমোদন পায় এ প্রকল্প; যেটির বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয় ১৫৯ কোটি দুই লাখ টাকা। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের কিছু কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলা ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে এর অবস্থান পৃথিবীর প্রভাবশালী ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। বাংলা ভাষার বহু ব্যবহারের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে এর ব্যবহারের ভূমিকা বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাধীনতার পর থেকে এ ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার ও এর মান অক্ষুণ্ন রাখতে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আশা কারা যায় যে, মুখে উচ্চারিত 'সঠিক' অ্যাপটি বাংলা ভাষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পোজ হয়ে যাবে, লিখিত বার্তা কম্পিউটার পড়ে শোনাবে, মুদ্রিত বই-দলিল সফট কপিতে রূপান্তরিত হবে, বাংলা ভাষার সঠিক অনুবাদ পাওয়া যাবে বাংলা ভাষার বিশাল মৌখিক ও লিখিত নমুনা (করপাস) গড়ে উঠবে। এ রকম ১৬টি উপাংশের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এ প্রকল্প। এর ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। সম্পূর্ণ বাংলা করপাস ও বাংলা স্টাইল-শিট সম্পন্ন হলে বিশ্বমানের বাংলা কম্পিউটিং-এর ভিত্তি তৈরি করা যাবে। এই ১৬টি উপাংশ হলো–

১. আন্তর্জাতিকমান বজায় রেখে পূর্ণাঙ্গ বাংলা করপাস উন্নয়ন করা;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিভাগ কর্তৃক তৈরিকৃত বাংলা ওসিআর-এর আরও উন্নতিসাধন এবং এর সঙ্গে হাতের লেখা শনাক্তকরণ পদ্ধতি একীভূত করা;
৩. কথা থেকে লেখা ও লেখা থেকে কথায় রূপান্তর সফটওয়্যার উন্নয়ন করা;
৪. জাতীয় কি-বোর্ড (বাংলা)-এর উন্নয়ন করা;
৫. বাংলা ভাষাশৈলীর নীতি প্রমিতকরণ করা;
৬. বাংলা ফন্ট আন্তঃক্রিয়া বা রূপান্তর ইঞ্জিন স্থাপন করা;

৭. বাংলা সিএলডিআর উন্নয়ন ও ইউনিকোড কনসোরটিয়মে জমা দেওয়া;
৮. বাংলা বানান ও ব্যাকরণ পরীক্ষক উন্নয়ন করা;
৯. বাংলা যান্ত্রিক অনুবাদ উন্নয়ন করা;
১০. স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার উন্নয়ন করা;
১১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাষিক যোগাযোগের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন করা;
১২. বাংলা অনুভূতি বিশ্লেষণের সফটওয়্যার উন্নয়ন করা;
১৩. একটি বহুভাষিক কন্টেন্ট রূপান্তর পদ্ধতি ও প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন করা;
১৪. সবচেয়ে জনপ্রিয় কিংবা ব্যবহৃত সাইটগুলো আন্তর্জাতিক ভাষায় অনুবাদ করা;
১৫. বাংলা ভিন্ন দেশের অন্য প্রচলিত ভাষার (ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষা) জন্য প্রমিত কি-বোর্ড তৈরি করা; এবং
১৬. বাংলা ভাষা সহায়ক আইপিএ ফন্ট ও সফটওয়্যার উন্নয়ন করা।

উপরিউক্ত ১৬টি সফটওয়্যার/টুলস-এর কাজগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বাংলা ওসিআর (অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন): বাংলা ওসিআর সফটওয়্যারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে মুদ্রিত কিংবা হাতে লেখা বর্ণমালা শনাক্ত করা যাবে। এ পদ্ধতিতে পিডিএফ থাকা বর্ণগুলোকে কম্পিউটারের মাধ্যমে দ্রুত শনাক্ত করা এবং সেগুলোকে টেক্সটে রূপান্তর বা লিখিত রূপ দেওয়ার কাজও করা যাবে। ওসিআর সিস্টেম অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের বাংলা ফাইল, যেমন– স্ক্যান করা বাংলা ফাইল (pdf/JPEG/PNG) ও ডিজিটাল ক্যামেরা দ্বারা ধারণ করা বাংলা ফাইলে ছবিকে সম্পাদনাযোগ্য এবং সার্চেবল টেক্সট ডেটাতে রূপান্তর করতে সক্ষম মুদ্রিত কিংবা হাতে লেখা বাংলা টেক্সট থাকবে; যার মধ্যে বর্ণসংখ্যার অক্ষর, বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্ন শনাক্ত করা যাবে। OCR ইঞ্জিন অবশ্যই অনুচ্ছেদ, ছবির ক্যাপশন এবং প্রয়োজনীয় টাইপোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য যেমন– বোল্ড, ইটালিক ও আন্ডারলাইন শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

বাংলা স্পিচ টু টেক্সট এবং টেক্সট টু স্পিচ: এর মাধ্যমে বাংলা কথাকে লেখায় এবং লেখাকে কথায় রূপান্তরের কাজ করা যাবে। রেকর্ড বা কারও কথাকে তাৎক্ষণিক লেখায় রূপান্তর করা যাবে। এর ফলে অনেক কাজে সময় কমে আসবে।

জাতীয় কি-বোর্ডের আধুনিকায়ন: কম্পিউটারে কম্পোজ আরও সহজ করতে জাতীয় কি-বোর্ডকে আরও সহজ করা হবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। এর ফলে বিভিন্ন অপারেটিং

সিস্টেম যেমন– উইন্ডোজ, ম্যাক, অ্যানড্রয়েড, আইওএসে একই ধরনের কি-বোর্ড ব্যবহার করা যাবে।

বাংলা স্টাইল গাইড: প্রযুক্তির সঙ্গে ভাষার সম্মিলনের প্রথম শর্ত হলো– ভাষার রীতি, ভাষা ব্যবহারের মান ও নীতি ঠিক করা। ভাষার এই মান ও নীতির সংগ্রহ হলো বাংলা স্টাইল গাইড। এটিও তৈরি করা হবে।

বাংলা বানান ও ব্যাকরণ সংশোধন: এতে যে সফটওয়্যার তৈরি হবে তার মাধ্যমে বাংলা ভাষার শব্দ, বানান, বাক্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনা করা যাবে। এটি যে শুধু ভুল বানান ধরবে তা নয়; বরং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করার পরামর্শ দেবে। এটি দিয়ে মোবাইল, কম্পিউটার ও অন্যান্য মাধ্যমে বাংলা বানান সংশোধন করা সম্ভব হবে।

করপাস বা বাংলা ভাষাংশ: বিশ্বের অন্যতম ভাষা হলেও বাংলা এখনো তথ্য-প্রযুক্তির বিবেচনায় সমৃদ্ধ ভাষা হয়ে ওঠেনি। আর এ জন্য দরকার ভাষাংশ বা করপাস তৈরি করা। যেটি হবে প্রতিনিধিত্বমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ। এটি তৈরিতে নানা প্রক্রিয়া জড়িত। সেগুলোর কাজ চলছে।

বাংলা থেকে আইপিএ (IPA) কনভার্টার: বাংলা ইউনিকোড টেক্সটকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট' বা 'আইপিএ'তে প্রকাশ করবে এই সফটওয়্যার। আইপিএ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা মানুষের দ্বারা উচ্চারিত প্রায় সব ধ্বনি লিখিতরূপে প্রকাশ করা যায়। সাধারণত অভিধান রচয়িতা, বিদেশি ভাষার শিক্ষার্থী-শিক্ষক, ভাষাবিদ, গায়ক, অনুবাদক এই বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে। এটি তৈরি হলে বাংলা ভাষার উচ্চারিত রূপকে আন্তর্জাতিকমান অনুসারে লেখা যাবে।

বাংলা মেশিন ট্রান্সলেটর ডেভেলপমেন্ট: যান্ত্রিক অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিভিন্ন ভাষায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা। এর অনুবাদকের মাধ্যমে তথ্যমূলক বাংলা, দৈনন্দিন বাংলা, প্রাতিষ্ঠানিক রচনা, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আবহাওয়া সংবাদসহ আরও অনেক কিছু দ্রুত নির্ভুলভাবে অনুবাদ করা সম্ভব হবে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার: এর উন্নয়নের মাধ্যমে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বা স্বল্পদৃষ্টির ব্যক্তিরা কম্পিউটার কিংবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে। স্ক্রিনে ভেসে ওঠা লেখা পড়ে শোনাবে এই সফটওয়্যার।

বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য সফটওয়্যার বা ডিজিটাল ইশারা ভাষা: এটি মূলত

সাইট টু স্পিচ সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে কোনো কম্পিউটার কিংবা মোবাইলের ক্যামেরার সামনে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইশারার ভাষায় কথা বললে সেটি স্পিচ বা কথা হিসেবে অনুবাদ হয়ে বলে দেবে। এটি এমনকি ইউনিকোডে টেক্সটেও রূপান্তর হবে।

সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস টুলস উন্নয়ন: এর মাধ্যমে কোনো কাগজপত্রে লেখা বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারবে সেটি ইতিবাচক, নেতিবাচক না-কি নিরপেক্ষ। এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটের মন্তব্য বিশ্লেষণ করা যাবে, যা যে-কোনো ধরনের জরিপের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

বাংলা ফন্ট কনভার্টার: অনেক সময় বাংলা ফন্ট বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে স্থানান্তরের সময় ভেঙে যায়। এমনকি কখনো একটি অ্যাপ্লিকেশন থেকে অন্য অ্যাপ্লিকেশনে নিলেও ফন্ট ভেঙে যায়। সেটা থেকে মুক্তি দেবে এ সফটওয়্যার।

ক্ষুদ্র-নৃগাষ্ঠী ভাষার কি-বোর্ড ও শব্দভাণ্ডার: দেশে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলো তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে খুব একটা ব্যবহার হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাষার মানসম্মত দালিলিক ও প্রামাণ্য উপাদান নেই। আবার এদের মধ্যে কিছু ভাষা বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। অনেক ভাষার পর্যাপ্ত তথ্য নেই, নেই ফন্টের এনকোডিংও। সেগুলোকে লিপিতে রূপ দেওয়া থেকে নানা ধরনের কাজ করা হবে।

বাংলা ইউনিকোড: ইউনিকোড-লিপি কম্পিউটারে লিখনপদ্ধতির একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান। বিশ্বের প্রায় সব প্রধান ভাষায় কম্পিউটার-লিপির জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা এই মান নির্ধারণ করে। এই সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে বাংলা ও অন্যান্য ভাষার ইউনিকোড মান নির্ধারণে সব ধরনের সমর্থন প্রদান করা হবে।

ভাষা-প্রযুক্তির সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম: এ প্রকল্পের সব সার্ভিসের মিলনবিন্দু হিসেবে কাজ করবে এই প্ল্যাটফর্মটি। এখানে ওসিআর, হাতের লেখা শনাক্তকরণ, যান্ত্রিক অনুবাদসহ অন্য সব সার্ভিস একসঙ্গে থাকবে। একজন ব্যবহারকারী ব্রাউজারের মধ্যমে এ প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে উল্লিখিত সার্ভিস ব্যবহার করতে পারবেন। এ ছাড়া এখানে থাকবে প্রোডাক্ট শোকেস, যা থেকে সার্ভিস ছাড়া ডকুমেন্টও ডাউনলোড করা যাবে (রহমান, ২০২৩)।

তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ

যে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এত আন্দোলন, এত আত্মত্যাগ সেই ভাষা আজ

কতটা টেকসই? শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই মাতৃভাষা ভুলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাকে ইংরেজির চেয়ে কঠিন মনে করে। ইংরেজি ভাষার আগ্রাসনের কারণে অনেক দেশের ভাষাই এখন অস্তিত্ব সংকটে।

বাংলায় গুগলের মতো 'সার্চ ইঞ্জিন' তৈরি হয়েছে দু-একটি (যেমন– 'পিপীলিকা', আর 'খুঁজুন'), তবে সেগুলোর কার্যকারিতা এবং প্রচলন জনবান্ধব হয়ে ওঠেনি (হক, ২০১৮)। মোস্তফা জব্বারের বিজয় কি-বোর্ড কম্পিউটার টাইপে বেশ ব্যবহার করা হয়; কিন্তু বাংলায় তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন সেবা ও সলিউশন্স ব্যবহার করা গেলেও ব্যবহারকারীকে নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন– টাইপে অভ্র, বিজয়, নিকসবেন, সোলায়মান লিপি ইত্যাদি ফন্ট সব একই ধরনের না হওয়াতে ফন্ট ভেঙে যায়। পিডিএফ (পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট) ফাইল থেকে ওয়ার্ডে কোনো কিছু কনভার্ট করতে গেলে অনেক সময় হয় না, হলেও ফন্ট ভেঙে যায়। যেমন– নিকসবেন ফন্ট থেকে বিজয় SutonnyMJ ফন্ট গুগলে কনভার্ট করলে ˂, ـ, য়, ড়, স্ত, ন্ত, ণ্ন ভেঙে এমনটি হয়। আবার ব্যাকরণে ভুল হওয়াসহ নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এমনকি মুখে বলে লিখতে গেলেও সমস্যা হয়। এসব সমস্যা দূর করতে সরকারের আইসিটি বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হাতে নিয়েছে 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প'। আর এ প্রকল্প নিয়ে মাঠে নামার পরেই পড়তে হয়েছে চ্যালেঞ্জের মুখে। এখনো প্রকল্পের সব কাজ শুরু হয়নি। প্রায় ৭ বছর ধরে এ প্রকল্প শুরু হয়েছে, কিন্তু সে হিসেবে কাজ হয়েছে সামান্যই। আইসিটি বিভাগ তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণের জন্য যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তাতে এ উপাদানগুলো তথ্য-প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা গেলে দেশের মানুষ 'দেশে তৈরি' (মেড ইন বাংলাদেশ) সেবা ও সলিউশন্স ব্যবহার করে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারবে। তবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কাজ শেষ করতে প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ পার হয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করেছেন। যেহেতু এ ধরনের কাজ আগে হয়নি, ফলে কাজে নেমে পদে পদে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে।

ইউনিকোডে যেহেতু ব্যঞ্জনের শেষে স্বর বসাতে হয়, অথবা যুক্ত ব্যঞ্জনের পর লিঙ্ক-চাবি বসাতে হয়, সেক্ষেত্রে কয়েকটি সংযুক্তি সমস্যার সৃষ্টি করে (হক, ২০১৮)। যেমন– ব্যঞ্জনের সঙ্গে রেফ বসানো, কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা বসানো কিংবা ও, ঔ-কার, ৎ দ্রুততায় টাইপ করতে চাওয়া ব্যবহারকারীর জন্য সমস্যা হয়। ইউনিকোডে বাংলা লিপি ঢ-ঢ়, ড-ড়, য-য় বর্ণে সমস্যা থাকাতে বড়ো

তথ্য (বিগ-ডাটা) বিশ্লেষণ, সার্চ ইঞ্জিন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় এবং ইন্টারনেট অব থিংসে বেশ সংকট দেখা দিচ্ছে। মুদ্রণ জগতে ইংলিশ লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির আকারের ক্ষেত্রে তারতম্য। বিভিন্ন বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহারে বাংলা লিপিতে চন্দ্রবিন্দুর ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ করা যায়।

যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে সমস্যাটা প্রকট। বাংলা ডাটা মাইনিং এখনো ইন্ডাস্ট্রির সমতুল্য হয়নি। ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল করতে দেখা যাচ্ছে বাংলা করপাসে অনেক সমস্যা।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন অভিধানে একই শব্দের প্রায় একই অর্থ হলেও বানান সমতা নেই। যেমন– *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*-এ ৯০২ পৃষ্ঠায় 'বেশি' ভুক্তিতে অল্পাধিক অর্থে এবং 'বেশী' ভুক্তিতে অধিক অর্থে লেখা হয়েছে। কিন্তু *আধুনিক বাংলা অভিধান*-এ ১০১৩ পৃষ্ঠায় 'বেশি' ভুক্তিতে অধিক অর্থে এবং 'বেশী' অর্থে বেশধারী লেখা রয়েছে। ভাণ্ডার (লাহিড়ী, ২০০৩: ৬৩৮), ভান্ডার (লাহিড়ী, ২০০৩: ১০৪৩) শব্দে বানান ভিন্নতা রয়েছে। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*-এর ১২৭ পৃষ্ঠায় 'আকাশ'-ভুক্তিতে লেখা হয়েছে 'অন্তরীক্ষ'। আবার একই অর্থে ৫৪ পৃষ্ঠায় 'অন্তরিক্ষ' ভুক্তিতে লেখা হয়েছে 'অন্তরিক্ষ'। একটি ই-কার দিয়ে, একটি ঈ-কার দিয়ে। অথচ, 'অন্তরীক্ষ' বানানের কোনো শব্দের ভুক্তি এই অভিধানে নেই। কোন শব্দটি ভুল এবং কোন শব্দটি শুদ্ধ? যদি কোনো একটি ভুল হয় তো এই অভিধানের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরও সংশোধন করা হয়নি। যদি উভয় শব্দ শুদ্ধ হয়, সেটা ভুক্তিতে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল। এছাড়াও তিরধনুক নাকি তীরধনুক, খ্রিস্টাব্দ নাকি খ্রীষ্টাব্দ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২১-এ ফেব্রুয়ারি নাকি ২১শে ফেব্রুয়ারি, কিবোর্ড নাকি কী-বোর্ড, তৈরি নাকি তৈরী, ইদ নাকি ঈদ, ঠিক নাকি সঠিক, ব্যবহারিক নাকি ব্যাবহারিক, দিঘি নাকি দীঘি, শিকারি নাকি শিকারী, একাডেমী, একাডেমি নাকি অ্যাকাডেমি, পুলিশ নাকি পুলিস, হিসেবে, হিসাবে, হিশেবে ইত্যাদি শব্দের বানান নিয়ে বিতর্ক মতামত রয়েছে। ফলে কম্পিউটারে 'সঠিক' অ্যাপসহ অন্যান্য সফটওয়্যার নির্মাণেও ভুল বানান কিংবা বানান সমতার ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এনসিটিবির বোর্ড-বইগুলো ই-বুক না থাকার কারণে ভুল-ত্রুটি সংশোধন কমপক্ষে এক বছরের বেশি সময় লাগে। এতে অনেকেই নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকে। আর ২০২২ কারিকুলামে 'নৈপুণ্য' অ্যাপ নতুন হওয়াতে ২০২৩ সালে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক ও বাৎসরিক মূল্যায়নে BI (Behavioral Indicator) ও PI (Performance Indicator) ইনপুটে অনেক সমস্যা

হয়েছিল। এক যোগে সারা দেশে 'নৈপুণ্য' অ্যাপে হিট করার কারণে হ্যাং হয়েছিল। ফলে শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের ব্লুব্রিক্স ধরে ধরে ক্রস চেক করে ঠিক সময়ের মধ্যে ভালোভাবে ইনপুট দিতে পারেননি। এই কারিকুলামে মূল্যায়নে সমস্যা থাকার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার ২০১২ সালের কারিকুলামে ফিরে আসার কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্বের ভাষাসমূহ নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান 'ইথলোলগ: ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর ২০তম (২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭) সংস্করণের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ৭০৯৯টি। মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। বিশ্বায়নের যুগে ভাষা সামাজিক প্রযুক্তির পাশাপাশি গবেষণার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সকল প্রযুক্তির ভাষা পরিভাষা পর্যাপ্ত পরিমাণে বাংলায় করা নেই হলে বাংলাভাষীদের অনেক ক্ষেত্রে সমস্যায় সম্মুখীন হতে হয়।

উপরি-উক্ত চ্যালেঞ্জ সমাধানে কিছু প্রস্তাবনা

মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা– এ তিনটির প্রতি বেশিরভাগ মানুষের হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা জাগ্রত হয়। বাংলাদেশে বাংলাভাষীদের ক্ষেত্রে এ কথা যেন আরও বেশি প্রযোজ্য। কেননা ভাষা আন্দোলনে বাঙালিরা মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা করেছেন, তা ইতিহাসে আজও সাক্ষী হয়ে আছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার প্রয়োগে প্রথম দিকে কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হলেও ভবিষ্যতে বাংলাভাষীদের জন্য অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আরও ভাবতে হবে (আরিফ, ২০১৫)। তাই উপরিউক্ত চ্যালেঞ্জ সমাধানে নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে–

শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষকদের ও গণমাধ্যমের জন্য একটি পরিমিত বাংলা ভাষা দরকার। শিক্ষকরা যদি নিজেই ভালো বাংলা না বলতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদের শেখার কোনো সুযোগ নেই। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করার আগে জরুরি হলো আমরা শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে এবং লিখতে পারি কিনা তা যাচাই করা। যারা বাংলায় লেখালেখি করেন, তারা অবগত আছেন ব্যাকরণসম্মতভাবে বাংলা বাক্য তৈরি করা এবং শুদ্ধ বানানে বাংলা শব্দ লেখা কতটা কঠিন। প্রথমত, আমাদের কতগুলো বিষয় আইনগত বাধ্যবাধকতার ভেতর নিয়ে আসতে হবে। আমরা চাই সর্বস্তরে বাংলা চালু হোক, বাংলা ভাষা যথাযথ মর্যাদা পাক; কিন্তু এই

ঔপনিবেশিক মনোভাব থেকে বের হতে না পারলে তা সম্ভব হবে না। আমাদের আধুনিক সমাজ ইদানীং বিদেশি ভাষার সংস্কৃতি, বিনোদন এবং সেসব ভাষা ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই স্রোত থেকে বের হয়ে আসতে হলে বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তি বোঝার উপযোগী করতে হবে।

২০১৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এক আদেশে দেশের সব সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, গাড়ির নম্বরপ্লেট, সরকারি দপ্তরের নামফলক এবং গণমাধ্যমে ইংরেজি বিজ্ঞাপন ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধ করতে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। এই স্রোত থেকে বের হয়ে আসতে হলে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে আধুনিক সমাজের উপযোগী করতে হবে। এ জন্য প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়ে ভাষার 'কম্পিউটেশনাল রিপ্রেজেন্টেশন' বর্ধিতকরণ বা যন্ত্র বোঝার উপযোগী করার বিকল্প নেই। উন্নত ভাষাগুলোর মতো বাংলাকে বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাগুলোর প্রয়োগ প্রতিনিয়ত বাড়াতে হবে।

সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এছাড়া বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭-এর ৩ ধারায়ও সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চিঠিপত্র, আইন-আদালতের প্রশ্ন-উত্তর এবং অন্য কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে (সরকার, ২০১৫)। এমনকি কম্পিউটারে বিদ্যুৎ বিল কিংবা টেলিফোনের বিলে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও খাতসমূহ রোমান লিপিতে না লিখে বাংলায় লিখতে হবে।

রাজধানীতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দেওয়া সংস্থা সিটি করপোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসার অনুমতি) নেওয়ার সময়ও সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে সাইনবোর্ডে বাংলা ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়। অতিরিক্ত একটি সিল দিয়ে ট্রেড লাইসেন্সে লেখা থাকে– 'সাইনবোর্ড বা ব্যানার বাংলায় লিখতে হবে'। এ জন্য আমাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে। নিজের মাতৃ ভাষার প্রতি যত্নশীল হতে হবে। আর সুযোগ থাকলে আমাদের ভাষাকে আরও শত সহস্র বছর বাঁচিয়ে রাখতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বিশেষত গুগল আমাদের বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য বহু সেবা যে বিনামূল্যে দিচ্ছে, সেগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে। যেমন– ট্রান্সলেটরে ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ যোগ করা, গুগলসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের রিভিউ বাংলায় লেখা, সামাজিক মাধ্যমে বাংলায় স্ট্যাটাস দেওয়া, ওয়েবসাইটে তথ্যবহুল বাংলা লেখা বাড়াতে উইকিপিডিয়ায় অংশগ্রহণ, প্রশ্ন-উত্তরের আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট কোরার

বাংলা বিভাগে প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজন করা যেতে পারে। এর ফলে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলার ব্যবহার বাড়বে, বাংলা ভাষা সংরক্ষণ হবে, বাংলা ভাষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন না হওয়ার কারণে আমাদের অর্জিত এই ভাষা আমাদের কাছে আজ ক্রমেই সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আধুনিক সমাজ ইদানীং বিদেশি ভাষার সংস্কৃতি, বিনোদন ও সেসব ভাষা ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই স্রোত থেকে বের হয়ে আসতে হলে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে আধুনিক সমাজের উপযোগী করতে হবে। এ জন্য প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়ে ভাষার 'কম্পিউটেশনাল রিপ্রেজেন্টেশন' বর্ধিতকরণ বা যন্ত্র বোঝার উপযোগী করার বিকল্প নেই। এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বাংলা ভাষাকেও আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হতে হবে। নইলে বাংলাদেশ বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতির যুগে পিছিয়ে যাবে। ভাষা আন্দোলনের একুশের চেতনাই পারে বাংলা ভাষাকে এগিয়ে যাওয়ার সেই উদ্দীপনা দিতে। ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভাষাবিদদের পাশাপাশি রাষ্ট্র এবং প্রযুক্তিবিদদেরও সক্রিয় হতে হবে। মায়ের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহার করেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া ও চর্চা এবং ভাষাকে টেকসই করায় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থেকে উৎসারিত সরকারি কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। ডিজিটাল জগতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়াতে কাজ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সফটওয়্যার বা টুলসের ব্যবহার পরিপূর্ণরূপে হলে তা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বাংলা ভাষা বৈশ্বিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। ডিজিটাল ডিভাইসে আরও ভালোভাবে এবং সহজে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া ও অনুবাদ সহজ হবে।

বাংলা একাডেমির বানানরীতি, কলকাতার বানানরীতি ও বাংলাদেশে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার ভিন্ন বানানরীতি মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আবার বাংলা একাডেমির বিভিন্ন অভিধানে একই শব্দের (একই অর্থ হলেও) ভিন্ন ভিন্ন বানান রয়েছে। তাই বাংলা একাডেমির বিভিন্ন অভিধানে একই শব্দের বানান সমতা করার জন্য বিশেষজ্ঞ ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ দ্বারা কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলে 'সঠিক' অ্যাপসহ অন্যান্য অ্যাপে কোন কোন বানানরীতি অনুসরণ করবে তা অভিজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে বাংলা একাডেমির অভিধানগুলোকে আধুনিক বানানে দ্রুত সংস্করণ করতে হবে।

এনসিটিবির বোর্ডবইগুলো বিনামূল্যে সারা দেশে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের কাছে বিতরণ করা হয়। অনলাইনে এনসিটিবির ওয়েবসাইটে পিডিএফ ফাইলও

দেওয়া থাকে। এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু মানুষ তো ভুলের উর্ধ্বে নয়। কম্পিউটার কম্পোজে কিংবা তথ্য পরিবেশনায় বইয়ে কিছু ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করতে প্রায় এক বছর সময় লাগা ভালো নয়। কেননা সচেতন শিক্ষকরা ওই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ভুল সংশোধন করে না দিলে দেশের অনেক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা অর্জনে ক্ষতি হতে পারে। আবার সামাজিক গণমাধ্যমে বোর্ড বইয়ের নেতিবাচক খবর প্রচার হলে দেশের ভাবমূর্তিও নষ্ট হয়। তাই বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বোর্ডবইগুলো ই-বুক করতে হবে। কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তা বেশি সময় না নিয়ে খুব অল্প সময়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের) দ্বারা সংশোধন করে অনলাইনে আপডেট ভার্সন আপলোড করতে হবে। যাতে করে স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকসহ অনেকেই আপডেট ভার্সন খুব সহজে ডাউনলোড করতে পারে।

সরকারের নিবন্ধনকৃত প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া কিংবা স্মার্টবোর্ডের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে করে শিক্ষকরা লেকচার মেথডের পাশাপাশি ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি, গ্রাফ, ম্যাপ, ভিডিয়ো, লেখা ইত্যাদি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দকর পাঠদান করতে পারেন। এজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠদান করা হলে বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের শিখনফলের জ্ঞান অর্জন স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হবে। তাই এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কেউ কেউ নেতিবাচক কাজও করছে। উদাহরণ হিসেবে গবেষণার থিসিস কিংবা বইয়ের কথা বলা যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বাংলা গবেষণায় সিমিলারিটি ইনডেক্স নির্ণয় করতে একটি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চৌযবৃত্তি ধরার সহযোগী সিমিলারিটি ইনডেক্স নির্ণয়কারী সফটওয়্যারটির নাম 'dubd21'। প্রাইমারি সোর্স হিসেবে 'dubd21' নামের এই সফটওয়্যারে বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন রিসার্চ আর্টিকেল, অ্যাসাইনমেন্ট অন্তর্ভুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে উইকিপিডিয়াসহ বিভিন্ন গবেষণা জার্নাল ব্যবহার হবে। তারপর নতুন কোনো গবেষণার সিমিলারিটি ইনডেক্স নির্ণয়ের জন্য সফটওয়্যারে ইনপুট করা হলে সফটওয়্যার সেটি নির্ণয় করবে।

বাংলা লিপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মানসম্পন্ন নীতি থাকা দরকার। স্পেল চেকার, অভিধান, ওসিআর ইত্যাদিসহ বাংলা লিপি ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলা

লিপি নিয়ে অ্যাডহক ভিত্তিতে কাজ না করে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কয়টি সমস্যা তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান করতে হবে। এসব বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে আরও সোচ্চার হতে হবে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনকে গুরুত্ব দিয়েই ভাষা বিকাশের ধারাকে উজ্জীবিত রাখতে হবে।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলার বিকাশ সাধনে গবেষণা, অনুবাদ, পরিভাষা, শুদ্ধ ভাষার কথন ও উচ্চারণ, প্রমিত বাংলা বানান রীতি, ভাষা নীতি ইত্যাদি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মাতৃভাষা বাংলার বিকশিত রূপই একদিন তাকে জাতিসংঘের ব্যবহারিক ভাষার দাবিতে পরিণত করবে এবং বাংলা হবে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা। আর এভাবেই বাংলা ভাষা বিশ্বায়নের ওপরে এক গভীর ও সুবিশাল প্রভাব বলয় তৈরি করবে।

সকল প্রযুক্তির ভাষা পরিভাষা পর্যাপ্ত পরিমাণে বাংলায় যুক্ত করতে হবে। তাহলে বাংলাভাষীদের মাতৃভাষায় গবেষণা করতে সহজ হবে। আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্যসহ বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ উপযোগী করার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হবে। পাশাপাশি চীন, জাপান, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের মতো চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ বিভিন্ন ধরনের বই বাংলা ভাষায় রচনা করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে স্কুল, কলেজ থেকে বাংলা মাধ্যমে পাস করা সাধারণ শিক্ষার্থীরাও খুব সহজে উচ্চতর লেখাপড়া মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে যেভাবে খুব সহজে উপলব্ধি করা যায়, তা বিদেশি ভাষায় সম্ভব হয় না। তাই bangla.gov.bd ওয়েবসাইটের ১৬টি টুলস যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), মাউশি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, নায়েম, এনসিটিবি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা আরও সক্রিয় থাকতে হবে। সরকারকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আরও বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, থাকবে। কিন্তু এর সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উন্নত ভাষাগুলোর মতো বাংলাকে বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাগুলোর প্রয়োগ প্রতিনিয়ত বাড়াতে হবে। এই প্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তি হলো ডাটা। তাই বাংলা ভাষার জন্যও প্রয়োজনীয় ডাটা সেট সংগ্রহ

ও সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য গবেষক, তথ্য-প্রযুক্তিবিদ, ভাষাবিদ ও সরকারকে একযোগে কাজ করতে হবে। 'বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল' bangla.gov.bd ওয়েবসাইটে ১৬টি টুলসের মধ্যে বর্ণ বাংলা OCR, কথা, উচ্চারণ, বাংলা পূর্ণাঙ্গ ফন্ট সফটওয়্যার ইউনিভার্সাল কি-বোর্ড সফটওয়্যার 'ইউবোড' বর্তমানে বেশ কার্যকর হলেও বাকি সফটওয়্যারগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত চালাতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তির বিশ্বে এই বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে বাঙালির প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের চেতনায় ঐকান্তিক চেষ্টা আরও বাড়াতে হবে। তবেই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বিশ্ববাসীর অন্যতম শক্তিশালী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যাশা করা যায় যে, ১৬টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ৪০টিরও বেশি সফটওয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হলে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও চিকিৎসা, প্রকৌশল, সাহিত্যসহ বিভিন্ন ধরনের বই বাংলা ভাষায় রচনা করা যাবে। আর বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের দেশের গুণগত বিভিন্ন ধরনের বাংলা বই, পত্রিকা বিশ্বের অনেক দেশের মানুষও তা অনুবাদ করে পড়তে পারবে এবং আমাদের দেশ তথা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে তারা জানতে পারবে। ভবিষ্যতে আমাদের দেশ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উন্নত দেশ হিসেবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করুক, সেই প্রত্যাশা করা যেতেই পারে।

তথ্য-নির্দেশ

চৌধুরী, জামিল। (২০১৬)। *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

জামান, আবু হেনা মোরশেদ রহমান ও রহমান, মো. তৈয়বুর। (২০২৪)। *স্মার্ট বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। আগামী প্রকাশন: ঢাকা।

ফকির, এ. বি. এম. রেজাউল করিম। (২০২২)। *ভাষা-সংসর্গ বিদ্যার নিরিখে বাংলা ভাষার সৃজন, উন্নয়ন ও অবনমন পরিক্রমণা*। সময় প্রকাশন: ঢাকা।

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন। (২০০৩)। *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

সরকার, স্বরোচিষ। (২০১৫)। *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা*। কথা প্রকাশ: ঢাকা।

আরিফ, হাকিম। (২০১৫)। মাতৃভাষা: ভাব, ভাবনা ও সম্ভাবনা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট *মাতৃভাষা* পত্রিকা, বর্ষ ০১, সংখ্যা ০১।

হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০১৮)। বাংলা ভাষা ব্যবহারে প্রযুক্তির সংশ্লেষ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট *মাতৃভাষা* পত্রিকা, বর্ষ ০৪, সংখ্যা ০২।

সরকার, এম. মেজবাহউদ্দিন। (২০২২, মার্চ ২)। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ। *দৈনিক দেশ রূপান্তর*।

রহমান, এম. মিজানুর। (২০২৩, ফেব্রুয়ারি ২১)। বাংলা ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তি: আমরা কতটা সমন্বয় করতে পারছি। *The Dhakapost*।

http://accessibility dictionary.gov.bd

https://www.bangla.gov.bd, Visited Date: 04.9.2024

naipunna.gov.bd, Visited Date: 04.7.2024

www.basis.org.bd, Visited Date: 04.9.2024

তথ্যপ্রযুক্তি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলা বানান

আল মাকসুদ *

Abstract: Spelling is the most significant part of any language, because it is a written form of language. Variation of spelling is the beauty of language as well. In the context of information technology, any language can make global communication easily. And for this reason it is very urgent to make combination with technology. But if any spelling of language loses its diversity, anarchy can raise in the field of the language. Needless to say, practical or functional aspects are fundamental in spelling. It seems spelling rules of Bangla Academy are not being implemented appropriately in many cases. As a result, spelling phobia and typography remain as is usual. The primary objective of my article is to present a research-based framework addressing why a universally acceptable solution to the problems of Bangla spelling has not been achieved and what challenges Bangla language users face due to this failure. Besides, it will make sure to what extent Bangla spelling maintains consistency and alignment in this age of unrestricted technological advancement.

মূলশব্দ (Keywords): বানান, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাকরণগত, ব্যবহারিক, সামাজিক যোগাযোগ, অভিধান।

---

* Al Maksud, Assistant Professor, Department of Bangla, Muminunnissa Govt. Mohila College, Mymensingh.

তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে বাংলা বানানের গতি-প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত এবং তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে বাংলা বানান কতটুকু তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ধারণা স্পষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বাংলা বানানের সম্পর্ক এখন অত্যাবশ্যক। প্রযুক্তি জীবনযাত্রাকে কেবল সহজ করেনি, ভাষার সচলতাকেও স্পষ্ট করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে ইংরেজি ভাষা যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে মিশে আছে, সেভাবে আমাদের ভাষা জাতীয়ভাবে প্রযুক্তিবান্ধব হতে পারেনি। কারণ এ নিয়ে যথাযথ প্রায়োগিক গবেষণার অভাব। তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী চলিষ্ণু একটি মাধ্যম। প্রযুক্তির সঙ্গে বানানের সম্পর্কায়ন পরম্পরাকে যুগোপযোগী না করতে পারলে ভাষার ভবিষ্যৎ বিস্তৃতি নিয়ে সংকট তৈরি হবে। বৈশ্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষার বানানকে যেমন অভিন্ন করতে হবে, তেমনই প্রযুক্তির সঙ্গে এর মেলবন্ধনটা হতে হবে সহজতর। প্রযুক্তিনির্ভরতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ইউজার-ফ্রেন্ডলি সফটওয়্যার ডেভেলপ করাটা এখন খুবই প্রয়োজন। প্রযুক্তি যেখানে বিশ্বের সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে 'ভাষা' একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ভাষার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি জড়িয়ে আছে গভীরভাবে। কিন্তু বাংলা ভাষার বৈশ্বিক আবেদনকে বিবেচনায় রেখে যে ধরনের পরিবর্তন ও প্রযুক্তির সংযোগ স্থাপন জরুরি ছিল তার কোনোটাই পর্যাপ্ত আকারে হয়নি। তার কারণ অবশ্যই আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ঠিক যেভাবে যুক্ত হতে পেরেছে, ঠিক সেভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারেনি। এখানে ওই মানের গবেষক, যারা ভাষাকে সহজতর করে তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করতে সক্ষম হবেন এবং বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ ব্যবহার অবাধ তথ্যপ্রবাহের প্ল্যাটফর্মে সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে—এ ধরনের গবেষক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এখনো তৈরি হয়নি। এজন্য আবশ্যক নতুন করে ভাষানীতি তৈরি করা এবং প্রযুক্তিনির্ভর একটি আউটলাইন তৈরি করা। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ভাষারই বানান থাকে এবং সে বানান ওই ভাষা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। তবে সব ভাষার বানান থাকলেও বর্ণমালা নেই। বাংলা ভাষার সৌভাগ্য এ ভাষার চমৎকার বর্ণমালা আছে, বানানরীতি আছে এবং আছে এর কথ্য ও সর্বজনীন চলিতরূপ। বানান ভাষাকে লৈখিক রূপ দিতে সহায়তা করে। পৃথিবীর সকল ঋদ্ধ ভাষার বানানশৈলী ভাষাপ্রেমীদের একটি প্রিয় অনুষঙ্গ। বানান নিয়ে খেলা ভাষাকে অবশ্যই গতিশীল করে। কিন্তু খেলাটা খেলো হয়ে উঠল কি না তা ভাবতে হবে বইকি। বাংলা বানান নানা স্তর অতিক্রম করে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। চর্যাপদের ভাষাও ছিল বাংলা। সেই ভাষার লিখিত রূপের সঙ্গে মধ্যযুগের ভাষার বানানে বিস্তর ফারাক। ফারাক রয়েছে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের; মধুসূদনের সঙ্গে পার্থক্য বঙ্কিমের, বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

আমাদের ফারাক ততটা নেই; বরং তাঁর সময়টাতেই তৈরি হয় নির্ভরতার সিলসিলা এবং আজও তিনিই মান্য। ব্যাকরণিক শক্ত কাঠামোর ওপর বাংলা ভাষা দাঁড়িয়েছে মূলত রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ভরসা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই। রবীন্দ্রনাথ কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে জানান–

> [...] উচ্ছৃঙ্খলতার বাঁধ বেঁধে দেবার কাজ তো শুরু করতেই হবে। সেইজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শরণ নিতে হল। কালক্রমে তাঁদের নিয়মের অনেক পরিবর্তন ঘটবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই পরিবর্তনের গতি একটা সুচিন্তিত পথ অনুসরণ যদি না করে তা হলে অব্যবস্থার অন্ত থাকবে না।
>
> নদীর তট বাঁধা আছে তবু তার বাঁক পরিবর্তন হয়, কিন্তু তট না থাকলে তার নদীত্বই ঘুচবে, সে হবে জলা। (ঠাকুর, ২০১২, পৃষ্ঠা ৪৫২)।

রবীন্দ্রনাথ বানানের উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বীকার করেছেন। এজন্য বাঁধেরও প্রয়োজন অনুভব করেছেন; কিন্তু বাঁধ থাকলেই নদীতট বাঁক বদল করবে না—ব্যাপারটা এমন নয়। ভাষারও বাঁক বদল হবে, নদীর যেমন হয়। ভাষার এই প্রবহমানতা ভাষার শক্তি ও সৌম্য। তবে পরিবর্তমানকে প্রশ্রয় করে বানানের যে বৈচিত্র্য তৈরি হয় তা অনেক সময় সমতা নিরূপণে সর্বজনীনতা লাভ করতে পারে না বরং ঘটে উল্টোটা, তথা বিশৃঙ্খলা। ফলে সাধারণ্যে তৈরি হয় উত্তরহীন অজস্র জিজ্ঞাসা। এসব জিজ্ঞাসা অমূলক নয়; কিন্তু এসবের জুতসই উত্তরও নেই। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন একটি বানানবিধি প্রবর্তন করে, তখন রবীন্দ্রনাথ তা মেনে নিয়েছিলেন—কারণ এ নিয়ম ভাষাকে সুশৃঙ্খল করবে এ-ই তাঁর বিশ্বাস ছিল। যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি প্রণয়নের পূর্বেই বিশ্বভারতী বিকল্প বানানরীতি প্রচলন করে রবীন্দ্রনাথের বইপত্র প্রকাশ করতে থাকে। এতে বিপত্তি বেড়েছে। এখনো তার কোনো সুরাহা হয়েছে এমন নয়। এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের একটি উদ্ধৃতি—যেখানে তিনি কিছু শব্দের বানান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বস্তুত একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন,

> [...] বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রপত্রিকায় কোনো নিয়মই অনুসরণ করা হচ্ছে না। কেউ কেউ মনে করছে, বাংলা ভাষা থেকে বোধ হয় ঈ বা ঊ কার লোপ করে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা যত্রতত্র ইকার-উকার চালিয়ে দিচ্ছে। একাধিক পত্রিকা সম্ভ্রমাত্মক 'তাঁরা শব্দে চন্দ্রবিন্দু পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলা ভাষায় যতদিন আপনি-তুমির ভেদ থাকবে, ততদিন তাঁরা-এঁরা এবং তার-এর-র পার্থক্য বজায় রাখতে হবে। [...] কোনো কোনো লেখককে দেখছি ঞ

> ও জ-য়ের যুক্তবর্ণ ঞ্জ ভেঙে ন্‌জ লিখতে। তাদের হাতে সঞ্জয় সঞ্জীব হয়ে উঠছে সন্‌জয় ও সন্‌জীব। আমরা প্রত্যেকেই যদি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে চাই, তাহলে মাৎস্যান্যায়ের পুনরাবির্ভাব ছাড়া উপায় কী! [আনিসুজ্জামান, ২০১৮: ১১১)

একটি ভাষা রূপগতভাবে—ধ্বনি, শব্দ, রূপ, বাক্য ও অর্থের সমন্বয়ে নির্মিত হয়। ধ্বনিভেদে শব্দের রূপান্তর ঘটতে পারে। বাক্য মূলত লৈখিক বা মৌখিক শব্দবিন্যাসের সার্থক রূপায়ণ। এখানে প্রয়োজন হয় বর্ণের। বর্ণ অক্ষর তৈরি করে। আর বর্ণের সার্থক পরম্পরা হচ্ছে একটি সার্থক বানান। আমরা প্রায়শ সার্থক বাক্যের কথা বলি, কিন্তু সার্থক বানানের কথা বলি না। সার্থক বানান না হলে কোনোভাবেই সার্থক বাক্য হওয়ার কথা নয়। তা যদি ভাবগত দিক থেকে অর্থ প্রকাশে সক্ষম হয়ও, লৈখিক রূপের শুদ্ধতা চিহ্নিত করতে না পারলে তা শেষ অব্দি একটি অপূর্ণাঙ্গ প্রকাশ বই অন্য কিছু নয়। এজন্য প্রয়োজন শুদ্ধ বানান। লক্ষণীয়—কোনো ভাষার প্রাচীন রূপ থেকে অধুনাতন রূপ অব্দি যত লিখিত তথ্য, উপাত্ত কিংবা প্রমাণপত্র রয়েছে, সেসবের প্রদর্শিত স্মারক হচ্ছে ওই ভাষার 'বানান'। বিভিন্ন কালখণ্ডে যে ধরনের বানানের প্রয়োগ হয়েছে—তার কোনোটাকে অশুদ্ধ বলার সুযোগ নেই। শুদ্ধ বানান লেখার ক্ষেত্রে প্রমিতায়নের প্রসঙ্গ জড়িত। বানান বিশেষজ্ঞগণ বানানের সমতা বিধানের লক্ষ্যে যে রীতিপদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন, তাকে বলা হচ্ছে প্রমিত বানানরীতি। ভাষা প্রবহমান এ কথা মানা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, আর বানান নিয়ত পরিবর্তনশীল এ কথা মানা ভাষার লৈখিক রূপের প্রতি সাধারণের ভীতি তৈরি করে দেয়া; সংশয় তো বটেই। সুতরাং দুটো দু'জিনিস—এটি আগে ভেবে নেয়া কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, বানানকে স্থিতিশীলতা দেয়ার আবশ্যকতা আছে; তাই বলে তা কখনোই পরিবর্তনযোগ্য নয়—এমনটা ভাবারও কোনো অবকাশ নেই।

বাংলা বানানের প্রমিতায়ন ও জটিলতা

বাংলা বানানের প্রমিতকরণে গুরুত্ব পেয়েছে মূলত মানভাষা। এখানে উপভাষাসমূহ ধর্তব্য হয়নি। ফলে ওইসব উপভাষা নিয়ে অজস্র মতান্তর থাকলেও কোনো দোষ নেই। সেসব ভাষার স্থির কোনো বানানরীতিরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে ভাষা সকলের কাছে সমান গ্রাহ্যতা পায়—পাওয়া বাঞ্ছনীয়, তার অবশ্যই সর্বজনীন বানানরীতি থাকাটা আবশ্যক। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেরকম বানানরীতি রয়েছে—যার কেতাবি নাম 'প্রমিত বানানরীতি'। বাংলা একাডেমি এ রীতি প্রণয়নের সর্বমান্য প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যাঁরা এ রীতি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের মতানৈক্য দূর হয়নি। এজন্য লক্ষ করা যায়, অধ্যাপক পবিত্র

সরকারের সঙ্গে ড. মাহবুবুল হকের মতবিরোধ রয়েছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সঙ্গে অধ্যাপক হায়াৎ মামুদের বানানভেদ রয়েছে এবং অভিধান সম্পাদনাকারী অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী কিংবা ডক্টর স্বরোচিষ সরকারের সঙ্গে অধ্যাপক জামিল চৌধুরী'র দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক রয়েছে চোখে পড়ার মতো। প্রথিতযশা লেখক যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কথা আপাতত মূলতবি রাখাই শ্রেয়। তবে বেশিসংখ্যক শিক্ষিত মানুষ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি মেনে চলবেন এটা নিশ্চয় কাম্য। অথচ বাস্তবে প্রমিত বানানরীতি মেনে চলার দৃষ্টান্ত খুবই কম। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজন পণ্ডিতের একই শব্দের বানানের ভিন্নতা এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ

ক. [...] বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটা ভাষা-নীতি থাকলে ভালো হতো, সেটা ধরে এক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যেত। সেই সঙ্গে এও আশা করব যে, বাংলা ভাষাশিক্ষায় আমরা যত্নবান হবো। (আনিসুজ্জামান, ২০১৮: ১১৮)

খ. [...] এই কথার মধ্যেই আরো একটা সংবাদ লুকানো আছে, তা হল— যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা এতই কম যে প্রায় তা অপরিচয়েরই শামিল। (মামুদ, ২০০৫: ৪)

গ. আমাদের অভিধান-অন্বেষার এক অনন্য নজির *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*। এই অভিধানটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো বাংলা ভাষায় বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক নতুন এবং কৃতঋণ শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা। (খান, ২০১৬: ১০)

ঘ. তিনি আরো বলেন যে, পদক্রম ও শব্দ নির্বাচনে কখনো কখনো পদ্যের অনুপ্রবেশ লক্ষ করা গেলেও, এই রচনা যে গদ্য, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। (মুরশিদ, ২০১৭: ৪)

ঙ. [...] সেই সঙ্গে ইতিপূর্বে মুদ্রিত অভিধানে প্রদত্ত বানানের সঙ্গে নতুন নিয়মের বানানের পার্থক্য তৈরি হয়েছে। [... ... ...] এ অভিধানটি বাংলা ভাষাপ্রেমী সবার কাজে লাগলে এবং তাঁদের কাছ থেকে বইটিকে আরও ঋদ্ধ করার পরামর্শ পেলে আনন্দিত হব। (হক, ২০১৭: ৯)

চ. যতিচিহ্নের প্রয়োগ যথাযথ না হলে বাক্য অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হতে পারে, এমনকি কখনও কখনও তা প্রত্যাশিত অর্থ প্রকাশ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। (সরকার, ২০১২: ২২৭)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে নিম্নরেখ শব্দগুলোর বানানরূপের ভিন্নতা নিয়ে আমাদের কিছু কথা আছে। যথাক্রমে— হতো, হবো, আরো, হল, কখনো—আবার হলো, আরও, হব, কখনও এই যে বানানভেদ তা কি বিভ্রান্তি নয়? হ্যাঁ, প্রশ্ন হতে পারে

এতে তো অর্থান্তর ঘটছে না। এ কথা মেনে নিলে এরূপ বহু শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভব। তাতে সংশয়ের পাল্লা ভারী হবে; হালকা হবে না। একটি মানভাষার বানান অবশ্যই সর্বজনীন হবে; সকলের বানানে অভিন্নতা থাকবে এবং কাঠামোবদ্ধ একটি রীতি মেনে চলবে—এ-ই হচ্ছে ভাষার দাবি। ভাষা চলিষ্ণু, বানানও চলিষ্ণু; কিন্তু বানান ব্যাকরণসিদ্ধ রীতিকে মেনে চলে—বিপরীতদিকে ভাষা কোনো কোনো রীতিকে উপেক্ষা করলে ক্ষতি নেই, উপরন্তু লাভ আছে। কারণ, এতে ভাষার অভিযোজন ক্ষমতা ঋদ্ধ হয়। মানে বানান তার নির্দিষ্ট রীতিকে লঙ্ঘন করলে, ভাষার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

স্মর্তব্য যে, উল্লিখিত প্রত্যেকেই বাংলা বানানে সমতা বিধানের লক্ষ্যে ঐকমত্য পোষণ করে একটি প্রমিত বানানরীতি প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তাঁদের বানানেই একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাহলে বাংলাভাষা ব্যবহারকারী সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণি কোন বানানটিকে গ্রহণ করবে? শব্দান্তে ক্রিয়াপদে ও-কারান্ত হবে কি না—এর কোনো স্পষ্ট সমাধান হয়নি। যার কারণে বিভ্রান্তি কোথাও কমেনি। যেমন—ছিলো-ছিল, হয়েছিলো-হয়েছিল, করবো-করব, কমলো-কমল, পারবো-পারব, করো-কর, পড়ো-পড়, শোনো-শোন, বলো-বল, দেখো-দেখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন বানানটাকে শুদ্ধ হিসেবে ধরে নেব—তার কোনো উত্তর জানা নেই। কারণ উভয় বানানেই বিদ্বজ্জনরা লিখছেন। অবশ্য বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বানানবিধি মতে, দ্বিতীয় বানানটি শুদ্ধ। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বোঝাতে করো, বলো, শোনো, দেখো ইত্যাদি লেখা যেতে পারে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে; যেমন—কোরো, বোসো ইত্যাদি এবং ক্রিয়াপদের রূপ হিসেবে হ ধাতুর শব্দরূপ হলো, হতো, হোন, হন ইত্যাদি শুদ্ধ। (চৌধুরী, ১৪২৩: ১৪১৪, ১৪২৪)। যদি তাই হয়, তাহলে হব, হত, হল এভাবে লেখা হচ্ছে কেন এবং লিখছেন কারা—এ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান জরুরি।

সমস্যা রয়েছে অন্যত্র, যেমন— ইতিমধ্যে, ইতিপূর্বে, মন্ত্রিপরিষদ, গুণিজন, কখনো, আরো, হলো, হতো, খ্রিষ্টাব্দ, খৃষ্টাব্দ, খ্রিস্টাব্দ, মনেপ্রাণে, সৌহার্দ্য, মর্ত্য, ব্যাবহারিক প্রভৃতি শব্দের বানান সম্পর্কে অভিধান, বানানরীতি এবং বানানবিশারদ এ তিনের কোনো সমন্বয় নেই এবং সেই সঙ্গে আছে কিছু বিদেশি ও দেশবাচক শব্দ, অতৎসম শব্দ, যথা— ঈদ, শহীদ, চীন, ঠাণ্ডা, ঝাণ্ডা, লণ্ঠন, মণ্ডা, ভাণ্ডার এসব শব্দের বানান কী হবে—তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। কোনো কোনো শব্দের বানান নিয়ে খোদ বাংলা একাডেমি যা করেছে তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে উপনীত

হয়েছে—যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। জামিল চৌধুরী সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*-এ 'ঈদ' বানানটিই নেই। *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*-এ অবশ্য ঈদ/ ইদ উভয় বানানকেই অভিধানভুক্ত করা হয়েছে (২০১০: ১৩৯, ১৪৫)। এতে সংকট কিছুটা কমেছে। কিন্তু বিধিমতে সর্বশেষ পরিমার্জিত অভিধানই অধিক গ্রহণযোগ্য।

৪৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় [২৩শে ও ২৪শে জানুয়ারি ২০২৪, তারিখে অনুষ্ঠিত] বাংলা প্রশ্নে (০০১ কোড) শব্দ শুদ্ধিকরণে 'ফরিয়াদী' ও (০০২ কোড)-এর প্রশ্নে 'ঠান্ডা' শব্দটি ছিল। 'ফরিয়াদী' ফারসি শব্দ (তথা বিদেশি শব্দ), সুতরাং এর শুদ্ধরূপ 'ফরিয়াদি' হবে। উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে, ওই পরীক্ষার উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় লেখা 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন'—এখানে 'সরকারী' শব্দটিও ফারসি; প্রমিতরীতি অনুযায়ী যার শুদ্ধরূপ 'সরকারি'। কিন্তু কভার পৃষ্ঠার ভুল বানানটি যথারীতি রয়ে গেছে। 'ঠান্ডা' শব্দটি অতৎসম। হিন্দি শব্দ থেকে আগত, সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত বানানটিই শুদ্ধ হওয়ার কথা—এর অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত রূপ হচ্ছে—'ঠাণ্ডা'। এটাকে বলা যায় জ্ঞাতসারে স্ববিরোধিতা। 'শহীদ' শব্দ বিদেশি শব্দ হওয়ার দরুন 'শহিদ' হওয়ার কথা; কিন্তু এখনো গণমাধ্যম বিশেষত প্রিন্ট মিডিয়ায় এ বানানটি মান্যতা পায়নি। 'কি' এবং 'কী' নিয়ে এখনো বির্তক থেমে নেই, তবে রবীন্দ্রনাথ ভরসাযোগ্য সমাধান দিয়েছেন—কেউ মানুক আর না মানুক। তিনি দেবপ্রসাদ ঘোষ (১৮৯৪–১৯৮৫)-কে বিষয়টির সমাধানকল্পেই মূলত এ বিষয়ে লিখেছিলেন; তা হলো—'তুমি কি জানো সে আমার কত প্রিয়' আর 'তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়', এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাত না থাকলে ভাবের তফাত নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না।' (ঠাকুর, ২০১২: ৪৪৫)। তবে রবীন্দ্রনাথ একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানানও প্রয়োগ করেছেন; তাতেও রয়েছে বিভ্রান্তি। তন্মধ্যে, খ্রিষ্টাব্দ একটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার সমিতি এ বিষয়ে 'প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে' বলে বিধান দিয়েছিল। (ভট্টাচার্য, ২০১৭: ১৩১)। বাস্তবে আমরা দেখি—'খ্রিষ্টাব্দ' শব্দটির সরকারি ও বেসরকারি দুটি রূপ তৈরি হয়েছে। সরকারি প্রজ্ঞাপনে লেখা থাকে, খ্রিস্টাব্দ অথবা খ্রি. আর অন্যত্র প্রায়শ দেখা যায় খ্রিষ্টাব্দ। কারণ বাংলাদেশে প্রচলিত অভিধানগুলোতে এ শব্দের বানানে হেরফের করা হয়েছে। তাদের ব্যাখ্যা হতে পারে—খ্রিষ্টাব্দ শব্দটি একটি বিদেশি শব্দ এবং মিশ্রশব্দ। তাই ষত্ববিধির নিয়ম মেনে এ ধরনের শব্দ খ্রিস্টাব্দ, খ্রিস্টান কিংবা খ্রিস্ট হবে। কিন্তু শব্দটি যিশুখ্রিষ্ট

নামক মহাপুরুষের নামানুসারে হয়েছে। খ্রিষ্ট-এর সঙ্গে সংস্কৃত অব্দ যুক্ত হয়ে, হয়েছে খ্রিষ্টাব্দ। সুতরাং ব্যক্তির নামে ষত্ববিধির নিয়ম কার্যকর হবে না; শব্দটির শুদ্ধ রূপ হবে 'খ্রিষ্টাব্দ'। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*-এ খ্রিষ্টান, *খটকা বানান অভিধান* মতে, খ্রিষ্টান কিন্তু পবিত্র সরকারের মত হচ্ছে—খ্রিস্টান শুদ্ধ। এতসব আলোচনার পর আমরা মনে করি—বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কার সমিতির রায় এক্ষেত্রে যথাযথ ছিল।

'ইতিমধ্যে' শব্দটি বাংলা সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী—ইতঃ+মধ্যে=ইতোমধ্যে। কিন্তু সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী 'ইতিমধ্যে'। অনুরূপভাবে, 'ইতিপূর্বে' হওয়ার কথা 'ইতঃপূর্বে'। বাংলা একাডেমির প্রচলিত অভিধান মতে, ইতিমধ্যে/ ইতিপূর্বে [অপ্র (অপপ্রয়োগ), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ২০১০: ১৩৮/ অশুপ্র (অশুদ্ধ প্রয়োগ) *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ১৪২৩: ১৮১]। এ-বিষয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ভিন্নমত পোষণ করে লিখেছেন, 'অভিধান বলে, শব্দটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ রূপ ইতঃপূর্বে। ইতিপূর্বে বহুল প্রচলিত, ইতঃপূর্বে শ্রুতিসুখকর নয়। ইতিপূর্বে বললে কী এমন ক্ষতি! [...] ইতিমধ্যে অভিধানমতে অশুদ্ধ, ইতোমধ্যে শুদ্ধ। একই যুক্তিতে কি ইতিপূর্বের মতো ইতিমধ্যেও চলে না?' (২০২১: ২৫)। ড. মাহবুবুল হক তাঁর *খটকা বানান অভিধান*-এ ঈদকে পরিহার্য লিখলেও, ইতিমধ্যে, ইতিপূর্বে বানান নিয়ে কোনোকিছুই লেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। মোটকথা এড়িয়ে গেছেন। পবিত্র সরকার লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে এই বানানে কোনো সমস্যা নেই। লিখুন। সংস্কৃতি [সংস্কৃত] 'ইতোমধ্যে' লেখার কোনো দরকার নেই (২০১৫: ২৫)।' পবিত্র সরকারের মতে 'মন্ত্রীপরিষদ' 'গুণীগণ' শুদ্ধ। (২০১৫: ৪১, ১০৩), ড. মাহবুবুল হকও এমতকেই সমর্থন করেন (হক, ২০১৭: ৫৪, ১৩৯)। তাহলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সিলেবাসে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের বানান বিষয়ক অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়, তাতে অসংখ্য শব্দের ভুল প্রয়োগ হচ্ছে জ্ঞাতসারে। যেমন—প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রীপরিষদ কিংবা ইতিমধ্যে, ইতিপূর্বে বানানগুলো ভুল;—এসবের শুদ্ধরূপ হবে যথাক্রমে প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রিপরিষদ, ইতোমধ্যে, ইতঃপূর্বে। সমস্যাটা হচ্ছে, বানানরীতি প্রণয়নকারীগণ ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারেননি। তাঁরা নিয়মের মাঝে বিকল্প রেখে জটিলতাকে আরো বৃদ্ধি করেছেন। যেমন: বিধিমতে—'সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন: গুণী→গুণিজন, [...] মন্ত্রী→মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন: গুণী→গুণীজন,[...] মন্ত্রী→ মন্ত্রীপরিষদ'

(চৌধুরী, ১৪২৩: ১৪১১)। তবে এও সত্য, যখন কোনো বানানবিধিতে বিকল্প প্রস্তাব রাখা হয়, তখন কোনোভাবেই একটি বানানকেই শুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা বিধিসম্মত নয়।

বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী কখনো/ কখনও উভয় বানানই হতে পারে। ডক্টর হকও তাই মনে করেন। পবিত্র সরকারের মতে, কখনও কিন্তু কখনোই। অপরদিকে অধ্যাপক জামিল চৌধুরী সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*-এ কখনো আছে কিন্তু কখনও-এর কোনো স্থানই হয়নি। ডক্টর হকের মতে আরো পরিহার্য, হবে আরও। কিন্তু শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, স্বরোচিষ সরকার আরও/আরো উভয়কেই গ্রহণ করেছেন। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* মতে, আরো–আরও-এর প্রচলিত বানান (চৌধুরী, ১৪২৩: ১৬৬)। এ ধরনের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য ও নির্দেশনা সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়নি বরং বানানের সমস্যাকে সমস্যাপীড়িত করেছে। তার মানে এই নয় যে প্রমিতায়নের বিষয়টিকে অযথার্থ মনে করা হচ্ছে। অবশ্যই যথার্থ। কিন্তু প্রয়োজন সমন্বয় ও সরলীকরণ। উপনিবেশিত বাংলায় বাংলা ভাষার বিপরীতে ইংরেজি ছিল রাজভাষা, খুব সঙ্গত কারণেই বাংলা ভাষা সেখানে আড়ষ্টতা মুক্ত হতে পারেনি। এখন বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমিত বাংলা কি না—তা ভাবা উচিত। উল্লেখ করা আবশ্যক, তা হচ্ছে—একজন লেখক কিংবা কবি কোনো ভুল শব্দকেও জনপ্রিয় করে তুলতে পারেন। তা জনমুখে প্রচারও পায়। সাধারণের কাছে আদৃত হয়—এমন দৃষ্টান্ত আছে ভূরিভূরি। রবীন্দ্রনাথ এ ধারায় অগ্রমান্য ব্যক্তি। তাঁর 'অশ্রুজল'-কে আমরা প্রমিতায়নের নামে যতই ভুল বলি না কেন, শব্দটির অন্তর্গত শাঁসটা ওই ভুলের মাঝেই নিহিত। আজকাল যেমন চলে, 'প্রসঙ্গ-কথা', 'জন্মবার্ষিকী' 'জন্মজয়ন্তী'র মতো ভুল শব্দগুচ্ছ—তাতে ভাষা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; তবে বানান শুদ্ধিকরণে এসব শব্দের অবতারণা শেষ বিচারে এক ধরনের ভাষিক অত্যাচার বটে। এজন্যই প্রয়োজন বানানবিধির সঙ্গে পণ্ডিতগণের সমন্বয় ও সমতাবিধান। তথ্যপ্রযুক্তি তো মূলত পণ্ডিতগণের উপস্থাপিত অভিন্ন বানানরীতিকেই সকলের কাছে তুলে ধরবে।

বানানরীতিকে যদি অভিন্ন করে তোলা না যায়, তাহলে প্রযুক্তির পক্ষে এর সর্বজনীন রূপ প্রতিষ্ঠা দেয়া সম্ভব নয়।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলা বানান

তথ্যপ্রযুক্তি বলতে আমরা বুঝে থাকি, তথ্যের আদান-প্রদানে ব্যবহৃত সকল ডিভাইসের কর্মপ্রণালি ও তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ। প্রযুক্তির সঙ্গে তথ্যের

সংযোগ ঘটাতে বিষয়টি এক জায়গায় স্থির থাকেনি। এর ব্যাপ্তি ও ব্যবহার উভয়ই বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমরা দেখে থাকব, এই তথ্যপ্রবাহের যুগে আমাদের ঘরের কম্পিউটার ও ল্যাপটপের চেয়ে হাতে নিয়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করা যায় এমন এন্ড্রয়েড মোবাইল সেটটি অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে এই ছোট্ট ডিভাইসটি হয়ে উঠেছে ভাষিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেড়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওই মাধ্যমটিই এখন মুখ্য মাধ্যম। এই মাধ্যমে প্রয়োগিত ভাষার চিত্র কেমন, তার সঙ্গে আমাদের আজকের আলোচ্য প্রবন্ধের নাড়ীর টান রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি এ তথ্যটি স্পষ্ট করে দিতে পেরেছে আমাদের ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত দুর্বল এবং আমাদের ভাষার বানান নিয়ে কোনো মাথাব্যথা রাখার দরকার নেই। বরং যে যেভাবে পার, লিখতে পার। তবে এটি অবশ্য বলতে হবে, বাংলা ভাষায় অসংখ্যজনের লেখালেখির আগ্রহ বেড়েছে শুধু তথ্যপ্রযুক্তির জন্য; হোক তা ভুল অথবা শুদ্ধ। ভাবটা এমন—হোক নতুন নতুন বানান, নতুন শব্দের আমদানি; আমার কথা আমার মতো করে লিখব, তাতে দোষ কী। সকলের সঙ্গে লেখক, কবি, সাংবাদিক, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞগণও যুক্ত হয়েছেন এ মাধ্যমে। এতে আমাদের বানান-দীনতা ও ভাষাগত ভাবচেতনার প্রকাশদৈন্যই বোধ করি সবচেয়ে বেশি প্রকটিত হয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই বানান ব্যবহারে তথ্যপ্রযুক্তির এই সহজগম্যতা ও অনিয়ন্ত্রিত সিস্টেম সমর্থনযোগ্য নয় বরং এসব ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সঠিকভাবে শব্দ ও বাক্যের গঠনরীতিকে প্রমিত বানানের নিয়মানুসারে বিভিন্ন ডিভাইস ও কম্পিউটারে ইনস্টল করবে—যাতে ভুল বানানের প্রয়োগ শূন্যের কোটায় নেমে আসে।

আমরা লক্ষ করে থাকব, প্রযুক্তির উদাসীনতায় শব্দ এসেছে যেমন– 'উপ্রে, বাপ্রে, কিয়েক্টাবস্থা, অস্সাধারণ, এক্টা, হইসে, খাইসে, ভাল্লাগছে, লাভিউ, বল্লে কিংবা বাক্য হিসেবে পেয়েছি, 'শাড়ী পড়ছি, কেমন লাগতাসে কমেন্ট করুণ', 'বইটা পইরা মজা পাইতাসি' ইত্যাদি। প্রথম কথা হলো এসব শব্দের বা বাক্যের গঠন নিয়ে, বানান নিয়ে কোনো আপত্তি তোলা যাবে কি না। দ্বিতীয় কথা হলো—এসব বাক্য ও শব্দচয়ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে অনেক বেশি গ্রাহ্য হয়ে উঠছে—ফলে বাংলা বানানের প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক কোনো গুরুত্ব থাকছে না। এজন্যই এখানে তথ্যপ্রযুক্তির জোরালো ভূমিকা জরুরি। যেমন, 'সঠিক'-এর মতো সফটওয়্যারকে জনপ্রিয় ও আরো সহজ করে তোলা আবশ্যক। তা না হলে ভুল বানানের ছড়াছড়ি, একই সঙ্গে ভুল বাক্য গঠনের হিড়িক বাড়বে। প্রযুক্তির কাজ হচ্ছে কোনো বিষয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা; কোনোক্রমেই বিশৃঙ্খল বা

এলোমেলো করে তোলা নয়। সত্য এই যে, সহজলভ্য ও পোর্টেবল ডিভাইসসমূহে কি-বোর্ড এবং বানানের যে সফটওয়্যার রয়েছে তা আমাদের বাংলা বানানের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ নয়। অভ্র কি-বোর্ড দিয়ে প্রয়োজন মেটানো যায়, কিন্তু পূর্ণতা দেয়া সম্ভব হয় না। বাংলা বানান অটো কারেকশনের কোনো অপশন কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল সেট এর কোথাও নেই। নেই বিশেষ স্ক্যানিং ব্যবস্থাও। এতে ইংরেজি শব্দের মতো একটি বাংলা শব্দের সঠিক বানান যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই। তাতে হরহামেশা ভুল হচ্ছে; আমরা ভুলটাকেই শুদ্ধ বলছি—কখনো শুদ্ধটাকেই বলছি ভুল। এ ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করে শুদ্ধ বানানের সফটওয়্যার যদি ডেভেলপ করা যায়, তাহলে ভুল বানান লেখার প্রবণতা কমে আসবে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। তথ্যপ্রযুক্তি যেভাবে মানবজীবনকে গতিশীল ও বহুমুখী করে তুলেছে, ঠিক একইভাবে বাংলা বানান-সমস্যাকে দূরীভূত করে সকলের কাছে সহজবোধ্য উপায়ও বের করা তথ্যপ্রযুক্তির পক্ষে সম্ভব। প্রয়োজন হলো সদিচ্ছা, তদ্‌সঙ্গে প্রয়োজন উন্নত কারিগরি বিদ্যা ও প্রকৌশলজ্ঞান; কারণ কাজটি মানুষকেই করতে হবে। বানান ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে না; কিন্তু ভাষাকে সাজিয়ে রাখে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। অপরের কাছে নান্দনিক করে তোলে। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাপক। আইসিটি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বিশেষ অধিদপ্তরসমূহ বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানকে প্রমিতকরণের মধ্য দিয়ে সকলের কাছে সহজ করে তুলতে পারে। এখানে রাষ্ট্রিক পোষকতার কোনো বিকল্প নেই। মোটকথা রাষ্ট্র যদি বানান বিষয়ে শৈথিল্য দেখায়, তাহলে জনসাধারণের কাছে, প্রতিষ্ঠানের কাছে বানান খুবই গুরুত্বহীন হয়ে উঠতে দ্বিধা করে না—যা ভীষণ পীড়াদায়ক বলে মনে করি। বাংলাভাষী শিক্ষিত মানুষ যে অনেক কিছুই শুদ্ধ বানানে লিখতে পারেন না—তার প্রমাণ আমাদের কাছে অপ্রতুল নয়। তথ্যপ্রযুক্তি যেমন সবকিছুকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তেমনই উন্মুক্ত করে বানানকে ছেড়ে দেয়া যায় না। রাশটাকে টেনে ধরতে হবে এবং উল্লেখ্য, ওই উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে বানানের শৈলীবৈচিত্র্যকে জনপ্রিয় করে তোলার দায় আমাদের আছে।

অবশ্যই অভিধানপ্রণেতাগণকে বানানের অনৈক্য দূর করতে ঐকমত্যে পৌঁছুতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি বাংলা শব্দের প্রায়োগিক শক্তিকে অধুনাবিশ্বে অধিকতর পরিচিতি দিয়েছে। কিন্তু এটি তো অবশ্যই মনে রাখতে হবে বানান ভাষাকে ঋদ্ধ করে; আর ভাষাকে ঋদ্ধ করে শব্দের প্রভূত ভান্ডার। তথ্যপ্রযুক্তি শব্দের সেই ভান্ডারকে ঋদ্ধ করতে সহায়তা করবে তাতে কোনো সংশয় নেই।

তথ্য-নির্দেশ

আনিসুজ্জামান। (২০১৮)। *বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য*। জাগৃতি প্রকাশনী: ঢাকা। [প্রথম প্রকাশ ২০১২]

আনিসুজ্জামান। (২০২১)। *আমার অভিধান*। প্রথমা প্রকাশন: ঢাকা।

খান, শামসুজ্জামান। (২০১৬)। ভূমিকা। জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

চৌধুরী, জামিল (সম্পা.)। (২০১৬)। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। বাংলা একাডেমি: ঢাকা। [১৪২৩]

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র*। খণ্ড-১৬। পাঠক সমাবেশ: ঢাকা।

ভট্টাচার্য, সুভাষ। (২০১৭)। *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান*। পঞ্চম মুদ্রণ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.: কলকাতা। [প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪]

মামুদ, হায়াৎ। (২০০৫)। *বাংলা লেখার নিয়মকানুন*। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা: ঢাকা। [প্রথম প্রকাশ ১৯৯২]

মুরশিদ, গোলাম। (২০১৭)। *ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা গদ্য: উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাস*। অবসর: ঢাকা।

সরকার, পবিত্র। (২০১৫)। *বানান-বোধিনী একটি অভিনব বানান অভিধান*। বাংলাপ্রকাশ: ঢাকা।

সরকার, স্বরোচিষ। (২০১২)। 'বাংলা যতিচিহ্ন'। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

হক, মাহবুবুল। (২০১৭)। *খটকা বানান অভিধান*। তৃতীয় মুদ্রণ। প্রথমা প্রকাশন: ঢাকা।

সিলেবল-তত্ত্ব ও চাক ভাষার সিলেবল সংগঠন: একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীন *

Abstract: A syllable is the smallest unit of pronunciation. From a phonological perspective, each language has a unique syllable structure. Syllables help to identify the probabilities and improbabilities in the arrangement of phonemes within a language. Additionally, the clear, consciously visualized notions or ideas of native speakers can often be found centered on the vowel, which is typically at the peak of the syllable. On either side of the syllable in any word, you will find the 'onset' and the 'coda.' In segmenting syllables, the phonetician Malmberg proposed a language-neutral ideal standard; however, this approach may not apply to the languages of ethnic groups. Each ethnic language exhibits unique characteristics and nuances that can be challenging to understand within a non-ethnic group's social language. The current status and syllable structure of the Chak language, which is a member of the Tibeto-Burman (TB) language family, are discussed in this article. It covers both open (free) and closed syllables, descending and ascending diphthongs, and the distinction between syllabic and non-syllabic elements in the Chak language. According to the ethnic language survey conducted in 2022 by the International Mother Language Institution (IMLI), the Chak language has been classified as

* Mohammad Taslim Uddin, Lecturer, Bangla Department, Hathazari Govt College, Chittagong & UGC Phd Fellow, Bangla Department, Chittagong University.

an endangered language in Bangladesh. This article discusses this extinct language's revival, preservation, documentation, and complex phonetic structure.

মূলশব্দ (Keywords): বিপন্ন ভাষা, মুক্ত-বদ্ধ সিলেবল, দ্বিস্বর সিলেবল, অনসেট, কোডা।

১. ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বান্দরবান সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্র্যে অনন্য একটি জেলা। এ জেলায় বারোটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস। [*]আলোচ্য চাক নৃগোষ্ঠীর বসতি কেবল বান্দরবানে দেখা যায়। জেলাটির দক্ষিণ-পশ্চিমে বাইশারী, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলিক্ষ্যং, কোয়াংঝিরি, ক্রোক্ষ্যং, কামিছড়া, বাকখালী, বাদুরঝিরি, দোছড়ি প্রভৃতি জায়গাতে এরা বাস করে। বাংলাদেশে এ জেলার বাইরে চাকরা ভারতের মনিপুর, অরুণাচল, মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ, মধ্য, উত্তর ও দক্ষিণ এবং লাওসে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছে। রাখাইন প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে চাকরা *সাক* (sak) নামে পরিচিত। 'চাক' একটি ক্রিয়াপদ। এর অর্থ হলো দাঁড়ানো। চাকরা তাদের নামের শেষে চাক লিখলেও মৌখিক পরিচয় প্রদানে নিজেদের *আসাক* (Asak) বলে থাকে (চাকমা, ২০০৯)।

চিত্র: চাক বসতি অঞ্চল (বান্দরবান, নাইক্ষ্যংছড়ি)

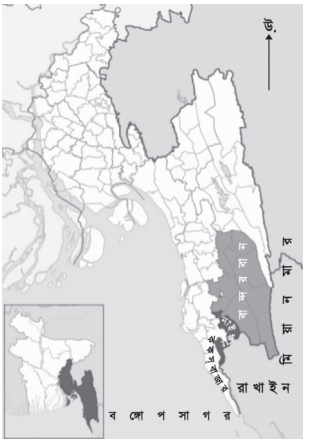

সূত্র: উইকিপিডিয়া

---

[*] Mohammad Taslim Uddin, Lecturer, Bangla Department, Hathazari Govt College, Chittagong & UGC PhD Fellow, Bangla Department, Chittagong University.

মিয়ানমার ও চীন সীমান্তঘেঁষে বাস করা *কাদু* নামক একটি নৃগোষ্ঠীও নিজেদেরকে *অসাক* পরিচয় দিয়ে থাকে (চাক, ২০০৬)। অন্যদিকে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চাকদের *সাক* (Sak) বা *থেক* এবং *মিৎসাক* সম্বোধন করা হয় (চাকমা, ২০০০)। জানা যায়, বুদ্ধ জন্মের হাজার বছর পূর্বেও রাখাইন রাজ্যের স্রউতে প্যু, কেংয়েং ও সাক জাতিসত্তার অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে মিয়ানমারে *সাক* ছাড়া অন্য জাতি দু'টির হদিস মেলে না (চাক, ২০২৪)। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই নৃগোষ্ঠী তাদের জাতিগত নামে *সাক* লিখলেও বর্তমানে *চাক* (Chak) ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জাতিতাত্ত্বিক Lucien Bernot, চাক আর *দৈংনাক* (Daingnek)-কে একই জাতি বললেও স্বতন্ত্র ভাষার জন্য সুগত চাকমা এদেরকে আলাদা নৃগোষ্ঠী বলে মন্তব্য করেছেন (চাকমা, ২০০৯)। সাকগণ ভারতের মনিপুর উপত্যকা ও মিয়ানমারের ইরাবতী নদীর কাসা অঞ্চলের *হুগং* উপত্যকার পূর্বে *তাগোহ্* নামক একটি প্রাচীন শহরে বাস করতো। মতান্তরে চৌদ্দ-পনের শতকে (Buchanon, 1798) বা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (চাক, ২০০৩) মিয়ানমারে চরম রাজনৈতিক অস্তিরতা দেখা দিলে সাকগণ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এই জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্যভূমে আসে বলে ধারণা করা হয় (চাক, ২০০৬)। বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় চাক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩,০৭৭ জন; যা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার ০.১৯% (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২২)।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের প্রান্তিক নৃগোষ্ঠী চাক। ভাষাবৈচিত্র্যে অনন্য এই জাতিগোষ্ঠী বান্দরবান পার্বত্য জেলার অন্যতম বাসিন্দা। এক সময়কার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির চাক নৃগোষ্ঠীর ভাষা দিন-দিনান্তে অবলুপ্তের দ্বারপ্রান্তে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিচালিত 'বাংলাদেশের নৃভাষাজরিপ' চাক ভাষাকে বাংলাদেশ থেকে বিপন্নের দ্বারলগ্নে যাওয়া চৌদ্দটি ভাষা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভাষা, সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ। নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতিকে বিপন্নতার কবল থেকে রক্ষার নিমিত্তে জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২০২২-২০৩২ সাল পর্যন্ত সময়কালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে চাক নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধকরত এ ভাষাকে বিপন্নতার কবল থেকে রক্ষার জন্য ব্যাপক ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধে চাক ভাষার সিলেবল ও এর সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে এ ভাষার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্রতা।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

চাক ভাষা বিপন্ন ভাষার তালিকাভুক্ত। টোনাল ভাষা হিসেবে পরিচিত এ ভাষার উপাদানকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করে এর ভাষাতাত্ত্বিক রূপ-পরিচয়

উদ্ঘাটন এবং ভাষাটির অন্তর্গঠনে সিলেবলের ভূমিকা দেখানোর ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধের যৌক্তিকতা আছে। এ প্রবন্ধের গঠনমূলক আলোচনা বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর ভাষা-সংগঠন ও কাঠামোগত বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

কোনো ভাষার আলোচনায় সিলেবলের ধারণা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ধ্বনির ক্ষুদ্রতম কার্যকর একক হলো সিলেবল। সিলেবলে অবশ্য একটি পরিপূর্ণ স্বরধ্বনির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত সিলেবল। বর্তমান গবেষণাকর্মটি মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এজন্য প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে, সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে, ভাষিক সম্প্রদায়ের কথোপকথনে উচ্চারিত শব্দ এবং বিভিন্ন প্রতিবেশে ব্যবহৃত চাকদের ভাষা-বৈচিত্র্যকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে চাক ভাষার সিলেবল (Hockett 1955, Haugen 1956, Davis 1988) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. গবেষণার মুখ্য প্রশ্ন

বর্তমান গবেষণার মূল প্রশ্নগুলি হলো:

- চাক ভাষার উচ্চারণগত ধ্বনিবৈজ্ঞানিক পরিচয় কী?
- চাক ভাষার সিলেবল সংগঠনে স্বতন্ত্রতা কোথায়?

এ গবেষণা প্রবন্ধে রাখা মুখ্য প্রশ্ন দুটির উত্তরকল্পে চাক ভাষার সিলেবলের (ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান) রূপ-পরিচয় এবং এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এখানে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক উঠে এসেছে এ ভাষার বিশিষ্টতা ও স্বতন্ত্রতা। ফলে, গবেষণাপ্রশ্ন বেশ ফলপ্রসূতা পেয়েছে এবং এটি লব্ধ ফলাফলে বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

৬. পূর্বগবেষণা পর্যালোচনা

সিলেবল সংগঠনের অন্যতম উপাদান স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি। কেউ কেউ সিলেবলের এই অভ্যন্তরীণ সংগঠনকে অস্বীকার করে কিছু ধ্বনিখণ্ডের সমন্বয়ে এর গড়ে উঠা (e.g. Kahn 1976, Clements & Keyser 1983) বলে অভিমত দিয়েছেন। Kostic & Das, *A Short outline of Bengali phonetics* (1972) গ্রন্থে বাংলা ধ্বনিমূল পর্যালোচনায় অক্ষরায়নকে (Syllabification) উচ্চারণমূলক ও শ্রুতিমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। ভাষাতাত্ত্বিক Dan, *Some issues in metrical phonology: the indigenous research tradition* (ebook, CIIL, 1992) গ্রন্থে বাংলা অক্ষরায়ণ প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এখানে তিনি বাংলা অক্ষরায়ণের ১০টি ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বিধিনিষেধ তুলেন

ধরেন। পবিত্র সরকার *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ* (২০২৩ পু. মু.) গ্রন্থে 'সিলেব্‌ল-তত্ত্ব ও বাংলা ভাষার সিলেব্‌লের সংগঠন' শীর্ষক প্রবন্ধে সিলেবলের সংগঠনে ন্যূনতম একটি স্বরধ্বনি [V] এর কথা বলেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষার সিলেবল সংগঠন নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন। তাঁর এ প্রবন্ধে বাংলা দ্বিস্বর সিলেবলসহ মোট ষোলোটি সিলেবলের উল্লেখ পাওয়া যায়। সরকার, বাংলা একাডেমি *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* ১ম খণ্ড (২০১১) এ 'ধ্বনিদল সংগঠন' নামে একটি ভুক্তি লেখেন। এই ভুক্তিটি তাঁর পূর্বতন প্রবন্ধ [সিলেব্‌ল-তত্ত্ব ও বাংলা ভাষার সিলেব্‌লের সংগঠন] এর পরিমার্জিত রূপ। উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী *ভাষাবিজ্ঞান* (২০১৬) গ্রন্থে লেখকদ্বয় বাংলা অক্ষর বা Syllable সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব ও পদ্ধতির কথা বলেছেন। বাংলা অক্ষরের গঠনে তিনি প্রারম্ভক (Initial margin), বাধ্যতামূলক উপাদান কেন্দ্র (Nucleus) এবং ইচ্ছামূলক উপাদান সমাপ্তক (Final margin) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অভিজিৎ মজুমদার *ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান* (২০১৯ পু. মু.) বাঙলা ও ইংরেজি দল বা Syllable এর গড়ন, দলে দ্বিস্বরের গঠন ও বৈশিষ্ট্য, বাংলা দলে দ্বিস্বর এবং দ্বিস্বর শ্রেণিকরণের মানদণ্ড নিয়ে দীর্ঘ আলোকপাত করেন। মহাম্মদ দানীাউল হক *ভাষাবিজ্ঞানের কথা* (২০২২ পু. মু.) গ্রন্থে অক্ষর (Syllable) নিয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক সিলেবলের মধ্যেই মুখ্য অংশ (Prominent segment) হিসেবে একটি স্বরধ্বনি উপস্থিত থাকে। এই স্বরধ্বনি আক্ষরিকতা (Syllabic) গুণবলে দলসংগঠন করতে সক্ষম। মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীন, *বাসব* মাতৃভাষাবিষয়ক সংখ্যা (২০২৪) এ 'ককবরক ভাষায় ধ্বনিদল (Syllable) সংগঠন ও স্বননশীলতা (Sonority): একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর ভাষায় সিলেবল সংগঠন এবং সিলেবলে স্বননশীলতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এখানে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো ককবরকেও স্বরধ্বনি স্বনন-শীর্ষে আর ব্যঞ্জনধ্বনি স্বননখাদে থাকে। এই প্রবন্ধে গবেষক ককবরক ভাষায় Mono-Hexasyllable পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক রূপ এবং সিলেবলে বেশি ও কম স্বননশীল ধ্বনিগুলোর সংগঠনও উপস্থাপন করেন। বলা যায়, ভাষার সিলেবল নিয়ে উপর্যুক্ত প্রতিটি গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে কোনো গবেষণার উপাত্ত মাঠপর্যবেক্ষণে সংগৃহীত নয়। ফলে পর্যাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতাহেতু কোনো নির্দিষ্ট ভাষার বিবিধ সিলেবলের দৃষ্টান্ত তেমন আসে নাই। বর্তমান গবেষণাটি মাঠভিত্তিক হওয়ার ধরুন এখানে চাক ভাষার সিলেবলকে কাঠামোবদ্ধভাবে উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭. চাক নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ও ভাষা

G. A. Grierson (1927) চাক ভাষাকে বৃহত্তর সিনো-টিবেটান বা ভোট-চীন পরিবারের টিবেটো-বার্মান বা ভোটবর্মী উপপরিবারের সাল গ্রুপের লুইশ উপগ্রুপের

সাক বা লুই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। চাক গবেষক হুজিয়ারা (২০১৬) সাল গ্রুপের পরে লুইশ উপগ্রুপের পূর্বে জিঙ্‌ফো-লুইশ-নুঙ্‌ফো গ্রুপের কথা উল্লেখ করেছেন। Grierson,STEDT [Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus Project] ও হুজিয়ারার গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে চাক ভাষাকে নিম্নোক্ত কাঠামোতে দেখানো হলো।

ডায়াগ্রাম-১: চাক ভাষার বংশলতিকা

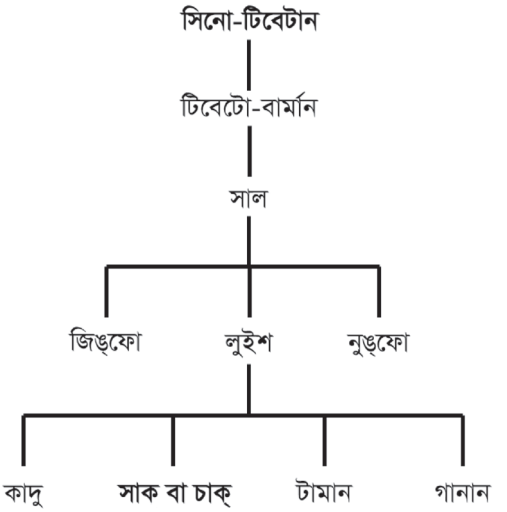

সূত্রঃ Keisuke (Cak-English-Bangla Dictionary) & STEDT Monograph Series

টিবেটো-বার্মান ভাষাসমূহকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় (ভারত), পশ্চিমাঞ্চলীয়, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সাক বা চাক ভাষা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় *সাল* (Sal) গ্রুপ থেকে জাত। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের চাক নৃগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে টিবেটো-বার্মানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বিশেষ করে উত্তর মিয়ানমার (রাখাইন প্রদেশ) এর মারমা ও রাখাইন ভাষার সাদৃশ্য যথেষ্ট। তাছাড়া টিবেটো-বার্মান হওয়ার ধরুন এই ভাষার কিছু শব্দের সঙ্গে ত্রিপুরা, ম্রো, পাংখোয়া, লুসেই, বম, খিয়াং ও খুমি ভাষার ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল দেখা যায়।

আবার, উত্তর মিয়ানমার উপত্যকায় বসবাসকারী কাদু (Kadu) এবং গানান (Ganan) ভাষার সঙ্গে চাক ভাষার ধ্বনি ও রূপগত সাদৃশ্য মেলে (গ্রিয়ারসন, ১৯২৭)। এ পরিপ্রেক্ষিতে Grierson (1927) উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরের

আন্দ্রো, সেংমাই এবং বাইরেল উপভাষার সঙ্গে চাক ভাষার সাদৃশ্য আছে বলে জানিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকদের দুটি প্রধান গোত্র/ দল ১. আন্দো এবং ২. ঙারেক্ এই দুটি গোত্রের আবার অনেক উপগোত্র আছে। সুগত চাকমা (২০০০) পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকদের আন্দো দলের লোকদের সঙ্গে মনিপুরের আন্দ্রোদের নাম ও ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। হুজিওয়ারা কেইসুকে (২০১৬) চাক ভাষার সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী *চাকপা* (Chakpa) জাতির ভাষার সাদৃশ্য উপস্থাপন করেছেন।

অন্যদিকে, সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা (১৯৯৪) চাকমা ও চাক জাতিসত্তার সম্পর্ক নিয়ে জানিয়েছেন চতুর্দশ শতাব্দীতে চাকমাগণ 'থায়েট মিও' এর পশ্চিমে মধ্য আরাকানের পাহাড়গুলিতে বাস করতো। সেখানে চাকমাগণ 'সাক' নামে পরিচিত ছিল। বর্মী সাক বর্তমানে বাংলাদেশে চাকমা নামে পরিচিত এবং চাকমাদের পুরাতন ভাষা 'লুই' ভাষার সঙ্গে চাক ভাষা সম্পর্কযুক্ত। Loffler (1964) বর্মী আর রাখাইনের চাকমারা চাককে *সাক* নামে অভিহিত করলেও এই জাতিগোষ্ঠী দুটি এক কিনা তা স্পষ্ট করেননি। সুগত চাকমা (২০০০) লফলারের উপর্যুক্ত মতামতকে খণ্ডন করে বলেন, চাকমা ও চাক ভাষা এক নয়।

ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, চাক ভাষার বাক্যগঠন বাংলার মতোই। অর্থাৎ এ ভাষার বাক্য কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদ প্রধান। যেমন–

সারণি-১: চাক ভাষার বাক্যগঠন

ভাষা	কর্তা	বিভক্তি	কর্ম	বিভক্তি	ক্রিয়া	চাক ও বাংলা বাক্য
চাক	ŋá ঙা		puk পুক		sá he সা হে	= [ŋá puk sá he] = ঙা পুক্ সা হে।
বাংলা	আমি		ভাত		খাই	= আমি ভাত খাই।
চাক	smuk স্মুক্	áŋ আং	duk দুক্	iŋ ইঙ্	nák áŋ নাক্ আং	= [smukáŋ duk iŋ nák áŋ] = স্মুক্আং দুক্ ইঙ্ নাক্ আং।
বাংলা	গরু	-কে	লাঠি	দিয়ে	মারো	= গরুকে লাঠি দিয়ে মারো।

ভাষা	কর্তা	বিভক্তি	কর্ম	বিভক্তি	ক্রিয়া	চাক ও বাংলা বাক্য
চাক	nániŋ নানিং				likláŋgi লিক্লাংগি	= [nániŋ likláŋgi] = নানিং লিক্লাংগি।
বাংলা	তোমরা				করবে	= তোমরা করবে।
চাক	kæŋsárá ক্যংসারা		ʈábe͡ টাবে	aŋ আং	dukiŋnáthe দুক্ইংনাত্হে	= [kæŋsárá ʈábe͡aŋ dukiŋnáthe] = ক্যংসারা টাবেআং দুক্ইংনাত্হে।
বাংলা	শিক্ষক		ছাত্র	-কে	বেতাচ্ছেন	= শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন।
চাক	ámliŋ আমলিং		álik আলিক্		likkoŋálâŋhe লিক্কোঙালাংহে	= [ámliŋ álik likkoŋálâŋhe] = আমলিং আলিক্ লিক্কোঙালাংহে।
বাংলা	তোরা		কাজ		করছিলি	= তোরা কাজ করছিলি।
চাক	ámliŋ আমলিং				likláŋhe লিক্লাংহে	= [ámliŋ likláŋhe] = আমলিং লিক্লাংহে
বাংলা	তিনি				করলেন	= তিনি করলেন।

চাক বর্ণমালার সঠিক সংখ্যা নিয়ে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। অংখ্যই চাক (২০২৪) চাক বা আচাক ভাষায় ৩৪টি ব্যঞ্জন ও ১১টি স্বরের কথা বলেছেন। অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাগবেষক সুগত চাকমা (২০০৯) চাক ভাষায় ২০টি ব্যঞ্জন /k/, /kʰ/, /g/, /ŋ/, /c/, /z/, /t /, /tʰ/, /d/, /n/, /p/, /f/, /v/, /t/, /b/, /m/, /r/, /l/, /s/, /h/ ও ৭টি স্বরধ্বনি /i/, /e/, /a/, /ə/, /o/, /u/, /ɛ/, একটি অনুনাসিক স্বরধ্বনি ã এবং দুটি অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি /w/, /y/ এর উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ-এশিয়ার ভাষাবিশারদ হুজিয়ারা কুইসুকে (২০১৬) চাক ভাষায় ২৬টি ব্যঞ্জন ও ৮টি স্বরধ্বনির একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে চাক ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি-

সারণি-২: চাক ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner of articulation)	উচ্চারণস্থান (Place of articulation)				
	দ্বি-ওষ্ঠ	দন্ত্য	তালব্য	জিহ্বামূলীয়	স্বরতন্ত্রীয়
স্পৃষ্ট	p, p^h, b	t, t^h, d		k, k^h, g	ʔ
ঘৃষ্ট			$\widehat{tʃ}$, $\widehat{tʃ^h}$, $\widehat{dʒ}$		
আবেগতাড়িত	ɓ	ɗ			
ঘর্ষণজাত	v	s ʃ			h
নাসিক্য	m	n		ŋ	
তরল		r, l			
সমকারক	w		y		

সূত্র: Keisuke, Huziwara (Cak-English-Bangla Dictionary)

কুইসুকে, চাক ভাষার স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য (Distinctive features) দেখাতে গিয়ে স্বরতন্ত্রীয় রাকা [ʔ] রেখেছেন। বলা যায়, রাকা সিলেবলের সমাপ্তক বা Coda হিসেবে অবস্থান নেয়। এটি কখনো সিলেবলের প্রারম্ভক বা Onset হিসেবে আসে না। Chomsky and Halle (1968) রাকা ধ্বনির বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন, [ʔ] is not [+consonant] but [-consonant], just like the glides [y, w]। বোঝা যাচ্ছে, রাকা ধ্বনিটি ব্যঞ্জনগুণ সমন্বিত।

চাক ভাষার স্বরধ্বনিগুলি নিম্নরূপ-

]সারণি-৩: চাক ভাষার স্বরধ্বনির অবস্থানগত পরিচয়

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থা		
	সম্মুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
উচ্চ	i	ɨ ɯ	u
মধ্য	e	ə	o
নিম্ন		a	

সূত্র: Keisuke, Huziwara (Cak-English-Bangla Dictionary)

চাক স্বরধ্বনিতে [ɯ] turned m দেখা যায়। সাধারণত CVC সংগঠনের সিলেবলে এটি কেন্দ্রীয় (Central) স্বরধ্বনি হিসেবে অবস্থান নেয়। CVC সংগঠনের বাইরে এটি এক সিলেবল (Monosyllable) সংগঠন CV এর কোডা এবং অনিয়মিতভাবে CCVC সংগঠনেও দেখা যায়।

Ethnologue : Language of the World এ চাক ভাষা হলো- [Ckh, ISO 639-3]। একটি ভাষার জীবনীশক্তি কতটুকু তা নির্ণয়ের নিমিত্তে এথনোলগ একটি আদর্শ স্কেল Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) এর দ্বারস্থ হয়েছে। এ স্কেল ১৩টি পর্যায়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভাষার বিপন্নতার লক্ষণগুলো প্রকাশ করে। এখানে স্কেলের ৬বি, ৭, ৮এ, ৮বি, ৯ সংখ্যা বিপন্ন ভাষার পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। উপর্যুক্ত স্কেলের নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে চাক ভাষা-

ডায়াগ্রাম-২ : চাক ভাষার অবস্থান

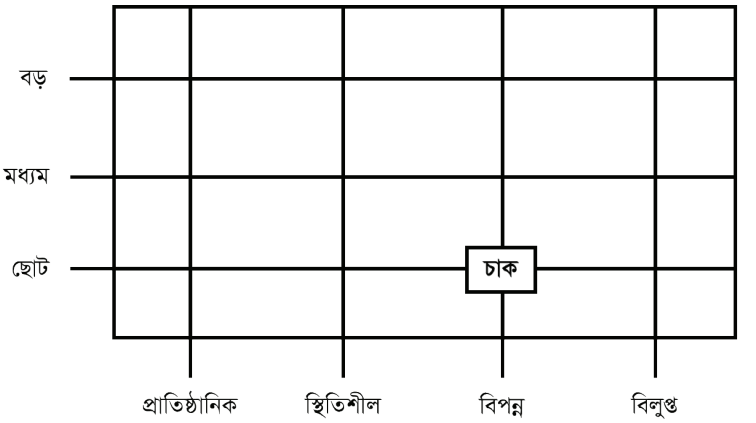

সূত্রঃ Ethnologue

এখানে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বক্তার জনসংখ্যা (Speaker Population) আর হরিজোন্টাল অ্যাক্সিস ভাষার জীবনীশক্তি (Language Vitality) নির্দেশক।

সুতরাং চাক ভাষার স্ট্যাটাস: বিপন্ন; স্কোপ: স্বতন্ত্র; ভাষানমুনা: জীবন্ত; ভাষা-এলাকা: মিয়ানমার, ভারত ও বাংলাদেশ; ভাষা-অঞ্চল: দক্ষিণ-এশিয়া।

ইউনেস্কো বিপন্ন ভাষার পর্যায় বিন্যাসে সাধারণভাবে বিপন্ন, নিশ্চিতভাবে বিপন্ন, গুরুতরভাবে বিপন্ন ও চূড়ান্তরকমের বিপন্নের কথা বলেছে। ডায়াগ্রাম-২ বিচারে দেখা যায়, চাক চূড়ান্তরকমের বিপন্নের তালিকায় থাকা একটি ভাষা। অর্থাৎ

চাক ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে বা বৃদ্ধগণ ভাষাটি একসময় ব্যবহার করতো এখন ভুলে গেছে বা যাচ্ছে।

৮. সিলেবল-তত্ত্ব ও চাক ভাষার সিলেবল

ভাষাগঠনে ধ্বনির পরেই সিলেবলের অবস্থান। স্বরের সহযোগিতা নিয়ে ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। বাংলায় 'প্'/p/ এই একক ফোনিমটি উচ্চারণে স্বরের সহায়তা নিয়ে একটি সিলেবল তৈরি করে। যেমন- প [pɔ], পি [pi], পু [pu] ইত্যাদি। ধ্বনি অবিভাজ্য হলেও সিলেবল অবিভাজ্য নয়। কারণ, সিলেবলের সংগঠনে একটি স্বর এবং এক বা একাধিক ব্যঞ্জন থাকতে পারে (সরকার, ২০২৩)। শুধু V দিয়ে সিলেবল তৈরি হচ্ছে, পৃথিবীতে এরকম ভাষা পাওয়া দুষ্কর। অর্থাৎ স্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জন থাকতেই হবে। কিন্তু চাক ভাষায় একটিমাত্র ধ্বনি দিয়েও [স্বরধ্বনি] সিলেবল গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন-চাক ভাষায় 'উ' [ú] (মুরগী) একটি ধ্বনি এবং সিলেবল। কোনো শব্দে কতগুলি সিলেবল আছে তা ওই শব্দের স্বরধ্বনি গণন করে বলা যায়। সিলেবল বিষয়টি সুস্পষ্টকরণে তিনটি দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দেওয়া হয় (মজুমদার, ২০১৯)।

ডায়াগ্রাম-৩: সিলেবলের রূপভেদ

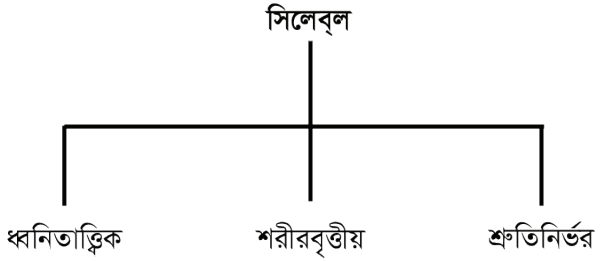

সূত্র: অভিজিৎ মজুমদার (ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান)

বর্তমান প্রবন্ধে উপর্যুক্ত ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonological) প্রক্রিয়ায় চাক ভাষার সিলেবল সংগঠন বিশ্লেষণ করা হবে।

স্বর [Vowel] ও ব্যঞ্জনের [Consonant] সংযোগে শব্দ গঠিত হয়। ধ্বনিগুলি অব্যবহিত ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন একক গড়ে তোলে। এভাবে স্বনিমের বাইরে স্বর ও ব্যঞ্জনের সমন্বয়ে যে ধ্বনিগত একক গড়ে ওঠে সেগুলিকে সিলেবল বলা হয়। অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ হলো সিলেবল। Katamba (1989) এর মতে,

> The syllable is the heart of phonology representations. It is the unit in terms of which phonological systems are organized. It is a purely phonological entity. It cannot be identified with a grammatical or semantic unit. There are syllables like (^n) as in unusual which are co-extensive with the morpheme; there are syllables like [kæt) a cat which is co-extensive with the word; there are syllables like [kæts) cats which represent more than one morpheme (the noun root cat and the plural marker-s) and there are syllables like [m^n] and [ki] in (m^nki) monkey which represent only part of a morpheme.

প্রকৃতপক্ষে, সিলেবলকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। প্রাগ্রসর ভাষাবিজ্ঞান কোনো কিছুর সংজ্ঞায়নের চেয়ে রূপ-পরিচয় প্রদানকেই প্রাধান্য দেয়। সুতরাং, এখানে সিলেবলের সঠিক পরিচয় দেওয়াকে মুখ্য ধরে এর সংগঠন চাক নৃগোষ্ঠীর ভাষায় কীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে স্বরধ্বনি (Vowel) এবং এক বা একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant) নিয়ে সিলেবল গঠিত হয়। সাধারণভাবে সিলেবল তৈরির জন্য ন্যূনতম একটি V (Vowel) স্বরস্বনিম থাকতেই হবে। এটি হবে সিলেবল কেন্দ্র (Syllable nucleus) বা তার শীর্ষচূড় (Nucleus)। সিলেবলচূড় ছাড়া সিলেবল তৈরি হতে পারে না। কেন্দ্রের দুপাশ সাধারণত ব্যঞ্জনস্বনিম (Consonant) দিয়ে তৈরি হয়। পৃথিবীর সব ভাষাতে একটি প্রচলিত সিলেবল হলো CV। তবে এ কাঠামো ভাষার সাপেক্ষে পরিবর্তনও হতে পারে।

সিলেবল গঠনে থাকে প্রারম্ভক বা Onset, কেন্দ্র বা Core এবং সমাপ্তক বা Coda। যদি স্বরধ্বনির আগে ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ থাকে, তাকে Onset এবং পরে ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছ থাকলে তাকে Coda বলে। চাক ভাষায় সিলেবল-সীমা শব্দসীমা অনুযায়ী হয়। সিলেবলের সংগঠন নিয়ে Hockett (1955), Haugen (1956), Davis (1988) প্রদত্ত সূত্রানুযায়ী এখানে চাক ভাষার সিলেবল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ডায়াগ্রাম-৪: সিলেবল-কাঠামো

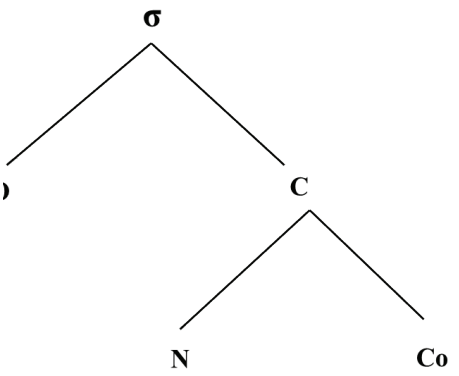

σ = Syllable
O = Onset (প্রারম্ভক)
C = Core (কেন্দ্র)
N = Nucleus (শীর্ষচূড়)
Co = Coda (সমাপ্তক)

সূত্র: Hockett, Haugen, Davis

উপর্যুক্ত ডায়াগ্রাম অনুযায়ী চাক ভাষার সিলেবলে প্রারম্ভক বা Onset, কেন্দ্র বা Core এবং সমাপ্তক বা Coda এর অবস্থান-

সারণি-৪: চাক ভাষায় সিলেবল-সংগঠন

চাক শব্দ	প্রারম্ভক	শীর্ষচূড়		সমাপ্তক
জোছ্ /d͡ʒotʃʰ/ (চড়ুই)	জ	উ	০	ছ্
শেঙ্ /ʃeŋ/ (টেক)	শ	এ	০	ঙ্
ধুক্ /dʰuk/ (লাঠি)	ধ	উ	০	ক্
য়ুঙ্ /ʲuŋ/ (খরগোশ)	য়	উ	০	ঙ্
জিহ্ /d͡ʒih/ (বাজার)	জ	ই	০	হ্
ফানেক্ /pʰánek/ (জুতো)	ফ	আ	ন	ক্
নেহ্ছ্ /ned͡ʒtʃʰ/ (দেবর)	ন	এ	হ্	ছ্
কাইন /kái̯n/ (তরকারি)	ক	আ	ই	ন
নাচক্ /nát͡ʃok/ (আংটি)	ন	আ	চ	ক্
কাফেগ্ /kápʰeg/ (কোমর)	ক	আ	ফ	গ্

উপর্যুক্ত সারণি থেকে বোঝা যায়, চাক ভাষায় সিলেবলের কেন্দ্রে স্বরস্বনিম উঠে আসছে। আর দুই ধারে প্রারম্ভক বা Onset এবং সমাপ্তক বা Coda-তে ব্যঞ্জনধ্বনি অবস্থান নেয়। চাক ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির মধ্যে সিলেবলের Onset ও Coda নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৮.১ চাক ভাষার সিলেবলে Onset ও Coda

সিলেবলকে Building blocks বলা হয়। শব্দ বা অর্থনির্মাণের অন্যতম দিক হলো এ সিলেবল। সিলেবল-সীমায় (Syllable boundaries) দেখা যায়, কিছু ধ্বনির ধ্বনিক উপস্থাপনা Onset-এ থাকে, এসব ধ্বনিক উপস্থাপনাকে আদি-ব্যঞ্জন বা প্রারম্ভক ধরা হয়। আবার, যে সমস্ত ধ্বনির ধ্বনিক উপস্থাপনা Coda-তে আছে কিন্তু Onset-এ নেই এসব সিলেবলকে অন্ত্য-ব্যঞ্জন বা সমাপ্তক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারণি-৫: চাক সিলেবলে Onset ও Coda

ব্যঞ্জনধ্বনি	Onset ও Coda	
ক্ [k]	Onset	কাফেক্ /kápʰek/ (কোমর) ক্যগ্প্যেং /kægpeŋ/ (পাটা) কাবং /kábəŋ/ (শাল)
	Coda	চোহাক্ /t͡ʃohak/ (মূত্র) আলাক্ /álak/ (চামড়া) কাছুক্ /kát͡ʃʰɯk/ (ব্যাঙ)
খ্ [kʰ]	Onset	খ্রাংথং /kʰraŋtʰaŋ/ (মশারি) খেথাকোলাগ্ /kʰétʰákólag/ (স্বাস্থ্য) খ্রাগ্ /kʰrag/ (উইপোকা)
	Coda	আরেক্খ্রে /árekkʰré/ (প্রকৃতি)
গ্ [g]	Onset	গায়ংছ্ /gaʲŋt͡ʃʰ/ (পেয়ারা) গোগ্ /gog/ (বাঁক্) গেঙ্দাপুহ্ /geŋdăpɯh/ (গন্ধপোকা)
	Coda	আচুগ্ /át͡ʃɯg/ (স্তন) লাদাগ্ /ládag/ (চা) আঙ্গা /áŋgá/ (মঙ্গলবার)

ব্যঞ্জনধ্বনি	Onset ও Coda	
ঙ্ [ŋ]	Onset	ঙারে /ŋáré/ (নরক) ঙাহু /ŋahu/ (মাগুর) ঙাচারেং /ŋát͡ʃareŋ/ (শিং)
	Coda	রোগাব্রঙ /rógábroŋ/ (মহামারি) আথিঙ্ /átʰɨŋ/ (কালো) তাক্মিঙ্ /takmiŋ/ (নখ)
চ্ [t͡ʃ]	Onset	চাক্হে /t͡ʃakt͡ʃʰé/ (ঝাল) চানিং /t͡ʃánɨŋ/ (শনিবার) চারাং /t͡ʃáraŋ/ (হিসাব)
	Coda	উআচা /uat͡ʃá/ (বায়না) লেআচা /lea̯t͡ʃá/ (নিড়ানি) আচা /at͡ʃá/ (খাদ্য)
ছ্ [t͡ʃʰ]	Onset	ছোছাছ্ /t͡ʃʰot͡ʃʰat͡ʃʰ/ (শসা) ছাইক /t͡ʃʰái̯k/ (কন্যা) ছাব্রেছ্ /t͡ʃʰábret͡ʃʰ/ (জাম)
	Coda	দংহারেংছ্ /dəŋháreŋt͡ʃʰ/ (খিরা) ইহ্ংছ্ /ɨhou̯t͡ʃʰ/ (জলপাই) ছলোহ্ছ্ /t͡ʃʰɔloht͡ʃʰ/ (আমলকি)
জ্ [d͡ʒ]	Onset	জিহ্ /d͡ʒɨh/ (বাজার) জেরাগ্ /d͡ʒerag/ (শালিক) জোয়েংছা /d͡ʒóʲeŋt͡ʃʰá/ (ছোট চামচ)
	Coda	পাজু /pád͡ʒu/ (জামা) প্রাংপাজু /praŋpad͡ʒu/ (বাহিরের শার্ট) চোজো /t͡ʃod͡ʒó/ (ভোর)
ঞ্ [ɲ]	Onset	ঞেক্হে /nekhé/ (খারাপ) ঞেংসাং /neŋʃaŋ/ (বুদ্ধিমান) ঞ্যঞ্য /næŋnæŋ/ (দুর্বল)
	Coda	ফুংঞো /pʰɯŋtó/ (সবুজ) আঞো /áŋó/ (নীল) পেংঞা /peŋŋá/ (বিদ্যা)

ব্যঞ্জনধ্বনি	Onset ও Coda	
ট্ [ʈ]	Onset	টাংলে /taŋlé/ (আখ) টানারি /tánárɨ/ (ঘণ্টা) টাছাব্রেং /tát͡ʃʰabreŋ/ (পুরুষ)
	Coda	মাগ্‌টা /magtá/ (সঙ্গে) আটে /áté/ (শ্বশুর)
ঠ্ [ʈʰ]	Onset	ঠোবেক /ʈʰobek/ (ঘি) ঠিং /ʈʰɨŋ/ (পড়া) ঠাংহে /ʈʰaŋhé/ (উপরে তোলা)
	Coda	খেংঠা /kʰeŋʈʰá/ (শরীর) আচাটিঠ্ /aʔt͡ʃáʈɨʈʰ/ (পাকস্থলি) আইট্‌ঠা /ai̯ʈʈʰá/ (স্ত্রী)
ড্ [ɖ]	Onset	ডেঙ্‌ব্রং /ɖeŋsrəŋ/ (মটর) ডামারা /ɖámárá/ (ডাকাতি) ডেংছানেং /ɗeŋt͡ʃʰáneŋ/ (সজনা)
	Coda	আংডে /áŋɗé/ (ধানের গোলা)
ত্ [t]	Onset	তুরুহ্ /turɯh/ (ফাঁসি) তাভেং /tábʱeŋ/ (রুটি) তুংহে /tɯŋhé/ (বসবাস করা)
	Coda	টুতে /tuté/ (গণনা) মিঙ্‌নেত্ /mɨŋnet/ (দুপুর) কুছেত্ /kɯt͡ʃʰet/ (চাউল)
থ্ [tʰ]	Onset	থং /dəŋ/ (হাজার) থাংমামুক /tʰaŋmámɯk/ (অন্ধকার) থিক্ /tʰik/ (চূড়া)
	Coda	ছাথে /t͡ʃʰátʰé/ (মহাজন) আথি /atʰɨ/ (বাকি) তাবোথৈ /táɓótʰoi̯/ (মাঘ)

ব্যঞ্জনধ্বনি	Onset ও Coda	
দ্ [d]	Onset	দানা /dáná/ (দান) দাইঙ্ /dai̯ŋ/ (শান্তি)
	Coda	লাংদা /laŋɗá/ (শকুন) ছাদা /t͡ʃʰáɗá/ (চন্দ্র) আংদে /áŋɗé/ (গোলাঘর)
ন্ [n]	Onset	নাক্তেক্ /naktek/ (রাত্রি) নেপোক্ /népok/ (বন্দুক) নোতেক্ /nótek/ (পরে)
	Coda	প্রাইন্ /prái̯n/ (রাষ্ট্র) কাইনছাইন /kái̯nt͡ʃʰái̯n/ (মাংস) কামুকাইন /káʔmukái̯n/ (ছত্রাক)
প্ [p]	Onset	পিহেকা /pɨheká/ (ভাঙা) পোক্তু /poktu/ (কুড়াল) পোংহেকা /poŋhéká/ (পণ)
	Coda	আতুংমিপো /átuŋmɨpó/ (খারাপ লাগা) আপা /ápá/ (দাদা) আস্পে /áʂpé/ (গন্ধ)
ফ্ [pʰ]	Onset	ফুশকেং /pʰɯʃkeŋ/ (পিঁপড়া) ফুঙ্লাগ্ /pʰɯŋlag/ (এলাচ) ফেছিং /pʰet͡ʃʰiŋ/ (মাহুত)
	Coda	নাফু /nápʰɯ/ (কপাল) পাক্ফি /pakpʰɨ/ (প্রজাপতি) কপিফু /kopipʰu/ (বাঁধাকপি)
ব্ [b]	Onset	বিক্রোগা /bɨkrogá/ (আমাশা) বাহক্ /báhok/ (ধনেপাতা) বাঅংছ্ /báəŋt͡ʃʰ/ (বেগুন)
	Coda	কাবা /káɓá/ (পৃথিবী) ইরাবা /ɨráɓá/ (কোদাল) ভেংবে /bʱeŋɓé/ (হাঁস)

ব্যঞ্জনধ্বনি	Onset ও Coda	
ভ্ [bʱ]	Onset	ভোহ্ভা /bʱohbʱá/ (বোবা) ভেংথাংছ্ /bʱeŋtʰáŋʧʰ/ (জোনাকি) ভ্বাক্ /bʱəbak/ (শূকর)
	Coda	রা্উভা /ra͡ub ʱá/ (পাগল) কাভো /kábʱó/ (বানর) আহ্রোব্ভা /árobbʱá/ (স্বামী)
ম্ [m]	Onset	মিক্ক্রে /mɨkkré/ (অন্ধ) মিক্শু /mɨkʃu/ (টেরা) মোছ্লা /mo͡tʃʰlá/ (মশলা)
	Coda	মাংছামি /ma͡ŋʧʰámɨ/ (রাজকুমারি) আছ্মা /áʧʰmá/ (যেখানে) ছিছামা /ʧʰɨ͡ʧʰámá/ (কবিরাজ)
য় [y]	Onset	য়াগ্ /ʲag/ (আজ) য়ুঙ্ /ʲɯŋ/ (খরগোশ) য়িপাপোংছা /ʲipápoŋʧʰá/ (কোমল)
	Coda	মায়া /maʲá/ (কোথায়) খোওয়া /kʰo͡oʷá/ (খুর) ছোওয়া /ʧʰo͡oʷá/ (চাবি)
র্ [r]	Onset	রিহে /rɨhé/ (মিলন) রেটুক্ /rétɯk/ (টিয়া) রুংহেকা /rɯŋhéká/ (ক্ষুধা)
	Coda	আহারা /áhárá/ (স্বাদ) আকাব্রা /ákabrá/ (ঢাল) আরা /árá/ (স্থান)
ল্ [l]	Onset	লাংলোহ্ক্ /laŋlonk/ (বাদুড়) লাগ্হেক্ /laghek/ (গুলতি) লেজু /le͡ʒu/ (বর্শা)
	Coda	ম্যাক্লে /mæklé/ (ধনুক) ছামুক্লা /ʧʰámukla/ (বলদ) রুংগালু /rɯŋgálu/ (ক্ষুধার্ত)

ব্যঞ্জনধ্বনি	Onset ও Coda	
শ্ [ʃ]	Onset	শিচো /ʃɨt͡ʃó/ (মলমূত্র) শারে /ʃáré/ (লালা) শেংকালং /ʃeŋkáləŋ/ (কাঠবিড়ালি)
	Coda	মিকশু /mɨkʃu/ (টেরা) ইশি /ɨʃi/ (চমকে উঠা)
স্ [s]	Onset	সুংহেকা /sɯŋheká/ (পরাজয়) সা /sá/ (তেল) সাংফসি /saŋpʰosɨ/ (মিষ্টি কুমড়া)
	Coda	আংব্রংসা /áŋbrɔŋsá/ (নাবালক) তাসো /tasó/ (উরু) আকানাস্যি /ákánássɨ/ (কানের ময়লা)
হ্ [h]	Onset	হাংবৈং /haŋbo͡iŋ/ (বন্ধু) হাই /ha͡i/ (থুথু) হাঠ্াঠাক্ /hát̪ʰat̪ʰak/ (তেতো)
	Coda	আছ্ভাহ্ /át͡ʃʰbʱah/ (দাঁত) আটাহ্ /át̪ah/ (পা) আপুরোহ্ /ápuroh/ (কীট-পতঙ্গ)

চাক ভাষার উপর্যুক্ত সিলেবলের Onset ও Coda বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়–

সারণি-৬: চাক ভাষায় ব্যঞ্জনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি

চাক ব্যঞ্জন	Onset	Coda
ক্ [k]	নিয়মিত	নিয়মিত
খ্ [kʰ]	নিয়মিত	অনিয়মিত
গ্ [g]	নিয়মিত	নিয়মিত
ঙ্ [ŋ]	নিয়মিত	নিয়মিত
চ্ [t͡ʃ]	নিয়মিত	নিয়মিত
ছ্ [t͡ʃʰ]	নিয়মিত	নিয়মিত
জ্ [d͡ʒ]	নিয়মিত	নিয়মিত
ঞ্ [ɲ]	নিয়মিত	নিয়মিত

চাক ব্যঞ্জন	Onset	Coda
ট্ [t̪]	নিয়মিত	অনিয়মিত
ঠ্ [t̪ʰ]	নিয়মিত	নিয়মিত
ড্ [d̪]	নিয়মিত	অনিয়মিত
ত্ [t]	নিয়মিত	নিয়মিত
থ্ [tʰ]	নিয়মিত	নিয়মিত
দ্ [d]	অনিয়মিত	নিয়মিত
ন্ [n]	নিয়মিত	নিয়মিত
প্ [p]	নিয়মিত	নিয়মিত

চাক ব্যঞ্জন	Onset	Coda
ফ্ [pʰ]	নিয়মিত	নিয়মিত
ব্ [b]	নিয়মিত	নিয়মিত
ভ্ [bʱ]	নিয়মিত	নিয়মিত
ম্ [m]	নিয়মিত	নিয়মিত
য়্ [y]	নিয়মিত	নিয়মিত

চাক ব্যঞ্জন	Onset	Coda
র্ [r]	নিয়মিত	নিয়মিত
ল্ [l]	নিয়মিত	নিয়মিত
শ্ [ʃ]	নিয়মিত	অনিয়মিত
স্ [s]	নিয়মিত	নিয়মিত
হ্ [h]	নিয়মিত	নিয়মিত

সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায়, চাক ভাষার সিলেবলে Onset-এ দ্ [d] আর Coda-তে খ্ [kʰ]; ট্ [ʈ]; ড্ [ɖ]; শ্ [ʃ] অনিয়মিতভাবে আসে। এছাড়া এ ভাষার অন্যান্য সিলেবলে Onset ও Coda নিয়মিত।

৮.২ মুক্ত ও বদ্ধ সিলেবল

সিলেবল, মুক্ত (Open) ও বদ্ধ (Closed) দুইই হতে পারে। যদি সিলেবলের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তাকে মুক্ত সিলেবল বা Open/Unchecked Syllable। আর যদি সমাপ্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে, তবে তাকে বদ্ধ সিলেবল বা Closed/ Checked Syllable বলে। চাক ভাষার মুক্ত সিলেবল ও বদ্ধ সিলেবল সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে সিলেবলের গঠনে অর্ধস্বরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

মুক্ত ও বদ্ধ সিলেবল- [১] তু /tɯ/ (ভাষা); [২] ফ্রা /pʰra/ (ভাটা); [৩] চো /t͡ʃo/ (মূত্র); [৪] জি /d͡ʒi/ (বাজার); [৫] রা /ra/ (তারা); [৬] মেঙ্ /meŋ/ (রাগ); [৭] এগ্ /ég/ (লাঙল); [৮] উহ্ /uh/ (মুরগী); [৯] পেপাক্ /pepak/ (চামচ); [১০] আলাক্ /alak/ (ত্বক)।

এখানে, [১] [২] [৩] [৪] ও [৫] এর দৃষ্টান্তে সিলেবলের Coda-তে ব্যঞ্জন অনুপস্থিত। অর্থাৎ সিলেবলটি স্বরধ্বনিতে শেষ বলে এটি মুক্ত। আর [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] দৃষ্টান্তে সিলেবলের Coda-তে ব্যঞ্জন রয়েছে। অর্থাৎ সিলেবলটি ব্যঞ্জনধ্বনিতে শেষ হয়েছে বলে এটি বদ্ধ। নিম্নে চাক শব্দে মুক্ত ও বদ্ধ সিলেবল কাঠামোসহ দেখানো হলো।

৮.২.১ মুক্ত সিলেবল (Open Syllable)

(a) V	:	আ /á/ (এক)
(a) CV	:	তু /tɯ/ (ভাষা), রা /rá/ (তারা), জি /d͡ʒɨ/ (বাজার)
(b) CCV	:	ফ্রা /pʰrá/ (ভাটা)

(c) CVCV	:	তাহু /táhu/ (হাত), পাজু /pád͡ʒu/ (জামা)
(d) CVCCV	:	রোক্‌সি /rokʂi/ (লেবু), টাংলে /ʈaŋlé/ (আখ)
(e) CCVCV	:	ছ্‌রিহে /t͡ʃʰrɨhé/ (চিকিৎসা)
(f) CVCVCV	:	পারাবা /párábá/ (কোদাল), তাহালে /táhálé/ (সপ্তাহ),

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তের আলোকে মুক্ত সিলেবল সাধারণ গাঠনিক সংকেত [কোডা ϕ] নিম্নরূপ-

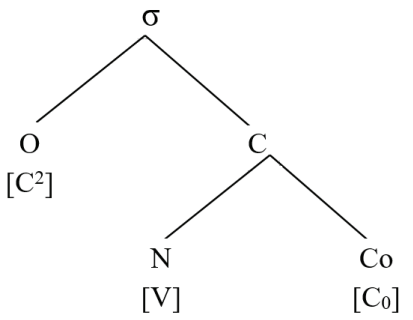

σ = Syllable
O = Onset
C = Core
N = Nucleus
Co = Coda

ডায়াগ্রাম-৫

দেখা যাচ্ছে, মুক্ত সিলেবলের Onset-এ দুইটি ব্যঞ্জন [C^2] আর Coda ব্যঞ্জনহীন [C_0] হতে পারে। অবশ্য Onset ও Coda এর কেন্দ্রে V থাকছেই।

৮.২.২ বদ্ধ সিলেবল (Closed Syllable)

(a) VC	:	এগ্ /ég/ (লাঙল), উহ্ /uh/ (মুরগী), উছ্ /ut͡ʃʰ/ (পাখি)
(b) VCC	:	উঙ্‌ছ্ /uŋːt͡ʃʰ/ (নারিকেল)
(c) VCVC	:	আছুক্ /át͡ʃʰɯk/ (হৃৎপিণ্ড), আলাক্ /álak/ (ত্বক)
(d) VCCVC	:	এালিং /ea̯liŋ/ (বন)
(e) VCVCC	:	উরেগ্‌ছ্ /ɯʔregt͡ʃʰ/ (বেল)
(f) CVC	:	মেঙ্ /meŋ/ (রাগ), নেঙ্ /neŋ/ (নাভি), গিগ্ /gɨg/ (ছিফটিপিন)

(g) CCVC : ছ্তাক্ /t͡ʃʰtak/ (তামাক), হ্রাং /hraŋ/ (বৃষ্টি), ছ্ছেং /t͡ʃʰt͡ʃʰeŋ/ (ওষুধালয়)

(h) CVCC : রগ্ছ্ /rəgt͡ʃ/ (লেবু)

(i) CVCVC : ডুছেক্ /duʔt͡ʃʰek/ (হাঁটু), পেপাক্ /pépak/ (চামচ)

(j) CCVCC : প্রেহ্ছ্ /premt͡ʃʰ/ (চালতা)

(k) CVCVCC : গায়ংছ্ /gáʲŋt͡ʃʰ/ (পেয়ারা), ছ্লোহ্ছ্ /t͡ʃʰəlóht͡ʃʰ/ (আমলকি), পানেঙ্ছ্ /páneŋt͡ʃʰ/ (কাঠাল)

(l) CVCCVC : লিক্শিক্ /lɨkʃɨk/ (ভাগ্নে)

(m) CVCVCVC : তাগানিঙ্ /tágániŋ/ (এককানি জমি)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তের আলোকে বদ্ধ সিলেবলের সাধারণ গাঠনিক সংকেত [অনসেট ϕ]-

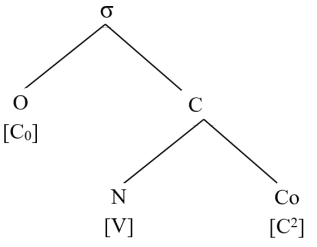

ডায়াগ্রাম-৬

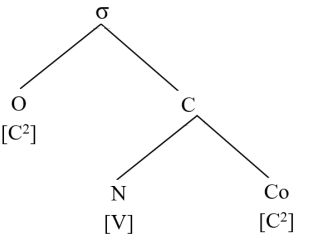

ডায়াগ্রাম-৭

অর্থাৎ বদ্ধ সিলেবলের Onset ব্যঞ্জনহীন [C_0] ও ব্যঞ্জনযুক্ত [C^2] দুইই হতে পারে। আর Coda অবশ্যই ব্যঞ্জনযুক্ত [C^2] হয়। এখানেও শীর্ষচূড়ে [V] থাকা আবশ্যক।

৮.২.৩ চাক ভাষায় পূর্ণস্বর আর অর্ধস্বরের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিস্বরযুক্ত সিলেবল নিম্নরূপ:

(a) VV̯ : আই /ái̯/ (ঠাকুরমা)

(b) VV̯C : এাং /ea̯ŋ/ (রাজা), আউক্ /au̯k/ (ভাসুর)

(c) CVV̯ : হাই /hai̯/ (থুথু), মাই /mai̯/ (চোখের জল)

(d) CVV̯C : চাউক /t͡ʃáu̯k/ (বই), লেএক /lee̯k/ (লাঙল)

(e) VCVV̯ : আয়ুআ /áʲua̯/ (কে), আতাউ /átau̯/ (ঘাম)

(f) VV̯CV : উআচা /ua̯t͡ʃá/ (বায়না), আউচা /áu̯t͡ʃá/ (ননদ)

(g) VV̯CVC : এধুং /e͡u̯dʱɯŋ/ (ঝড়োহাওয়া)

(h) VV̯CCV : আইট্ঠা /ái̯ttʰá/ (স্ত্রী)

(i) CVCVV̯ : কুরাউ /kura͡u̯/ (পাগলা কুকুর)

(j) CVV̯CV : লেআচা /le͡a̯t͡ʃá/ (নিড়ানি), চাউস্ী /t͡ʃa͡u̯ʂɨ/ (কলা)

(k) CCVVCV : প্রোআছা /próa̯t͡ʃʰá/ (বারান্দা)

(l) CVV̯CCV : হাইনদা /ha͡i̯ndá/ (দেয়াল)

(m) CVV̯CVC : কাএকুং /kaetʰkɯŋ/ (হলুদ)

(n) VCCVCVV̯ : আছ্গালুআ /át͡ʃʰgálu͡á/ (কোনটি)

(o) VV̯CVCVCVC : আইতালাপোহ্ /ái̯tálápoh/ (বিবাহ)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তের আলোকে দ্বিস্বরযুক্ত সিলেবলের সাধারণ গাঠনিক সংকেত [অনসেট ϕ] দেখানো হলো।

ডায়াগ্রাম-৮

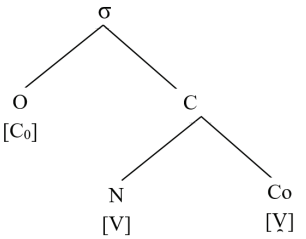

ডায়াগ্রাম-৯

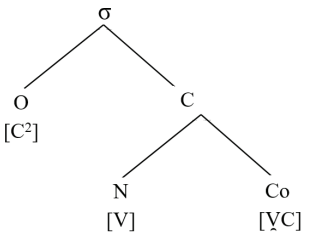

এখানে দেখা যাচ্ছে, দ্বিস্বর সিলেবলের Onset ব্যঞ্জনহীন [C_0] ও ব্যঞ্জনযুক্ত [C^2] দুইই হতে পারে। আর Coda তে অর্ধস্বর [V̯] এবং অর্ধস্বর পরবর্তী ব্যঞ্জন [V̯C] থাকতে পারে। এখানেও শীর্ষচূড়ে V অবস্থান নেয়।

Diphthong বা যৌগিক স্বরে দুটি স্বরধ্বনির পারস্পরিক অবস্থানে একটি সিলেবল তৈরি হতে দেখা যায়। স্বর দুটির প্রথমটি পূর্ণস্বর আর দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর। পূর্ণস্বর বলে প্রথমটি সিলেবলকেন্দ্র বা সিলেবলের মূলভিত্তি যা Syllabic বা সিলেবলীয়। আর অন্যটি নিজে স্বতন্ত্র সিলেবল তৈরিতে করতে পারে না বলে এটি nonsyllabic বা ননসিলেবলীয়। এই nonsyllabic বা ননসিলেবলীয় স্বরধ্বনিটি পূর্ণস্বরের সাপেক্ষে অর্ধস্বর (সরকার, ২০২৩)। চাক ভাষায় দ্বিস্বরাশ্রিত সিলেবলগুলি নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি-৭: চাক ভাষায় দ্বিস্বরধ্বনি

Vowels	Glides			
	i̯	u̯	e̯	a̯
i	-	-	-	-
u	-	-	-	u͡a̯
ɘ	-	-	-	-
e	-	e͡u̯	-	e͡a̯
o	-	-	-	-
ɨ	-	-	-	-
ɯ	-	-	-	ɯ͡a̯
a	a͡i̯	a͡u̯	a͡e̯	-

উচ্চারণরীতির দিক থেকে চাক ভাষার দ্বিস্বর সিলেবল অবরোহী (Falling)। কেননা এখানে দ্বিস্বরের প্রথম সদস্যটি দ্বিতীয় সদস্যের তুলনায় প্রকট (Prominent)। জোনস (১৯৯৭) এর মতে, প্রথম সদস্য প্রকট হলে অবরোহী আর দ্বিতীয় সদস্যটি প্রকট হলে আরোহী (Rising) দ্বিস্বর হয়। দ্বিস্বরে একটি সূচনাবিন্দু (Starting point) আর একটি সমাপ্তি-বিন্দু (End-point) থাকে। এখানে সূচনাবিন্দুটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। কিন্তু সমাপ্তিবিন্দু সংক্ষিপ্ত এবং ক্ষণস্থায়ী।

এখানে দেখা যাচ্ছে, দ্বিস্বর একটি সিলেবল নিয়ে গঠিত। গঠনের দিক থেকে দ্বিস্বর এককস্বর (Monophthong) অপেক্ষা জটিল। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাপর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভাষাতেই দ্বিস্বর আছে। আর এইসব ভাষার শতকরা ৭৫ ভাগ [a͡i̯] শ্রেণির, আর ৬৫ শতাংশ ভাষায় [a͡u̯] শ্রেণির দ্বিস্বর (উদ্ধৃত, মজুমদার, ২০১৯)। দেখা যাচ্ছে, চাক ভাষাতেও [a͡i̯] ও [a͡u̯] শ্রেণির দ্বিস্বর সিলেবল বেশি।

৯. চাক ভাষার বিভিন্ন ধরনের সিলেবল সংগঠন উদাহরণসহ দেখানো হলো:

৯.১ Monosyllable বা এক সিলেবল: মুক্ত

(a) V : আ /á/ (এক)

(b) CV : চো /t͡ʃó/ (মূত্র), আছ্ /át͡ʃʰ/ (ফল)

(c) CCV : ফ্রা /pʰrá/ (ভাটা)

Monosyllable বা এক সিলেবল: বদ্ধ

(a) VC : ইহ্ /ɨh/ (জল)
(b) CVC : মাঙ্ /maŋ/ (টিকচিহ্ন)
(c) CCVC : হ্রাং /hraŋ/ (বৃষ্টি)

চাক ভাষায় একটা V দিয়েও সিলেবল হতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো এ ভাষায় CV প্যাটার্নটা বেশি লক্ষ করা যায়। Monosyllable-এর Onset-এ একটি V অথবা C থাকতে পারে। আর মুক্ত বা Open-এর Coda-তে থাকলেও বদ্ধ বা Closed-এ C থাকে।

৯.২ Disyllable বা দ্বি সিলেবল: মুক্ত (ক)

(a) V.CV : উকু /uku/ (কলস), আপা /ápá/ (ভাই)
(b) VC.CV : ইংদি /ɨŋdɨ/ (প্যান্ট), আস্পে /áspe/ (গন্ধ)

Disyllable বা দ্বি সিলেবল: মুক্ত (খ)

(a) CV.CV : মাতা /mátá/ (এখানে)
(b) CVC.CV : মুক্হে /mɯkhé/ (ফু দেওয়া)
(c) CCVC.CV : প্রঙ্গো /proŋgó/ (জকজক)

Disyllable বা দ্বি সিলেবল: বদ্ধ (ক)

(a) V.CVC : আপিক্ /ápɨk/ (পেট), আমুহ্ /ámɯh/ (চাল)
(b) VC.CVC : আছ্লিক্ /átʃʰlɨk/ (জিহ্বা)
(c) VC.VC : আলাগ্ /álag/ (চর্ম)
(d) VCC.CVC : উংছ্নুং /uŋtʃʰnɯŋ/ (ডাব)
(e) VCV.CVC : আকাহাং /ákáhaŋ/ (পিঠ)

Disyllable বা দ্বি সিলেবল: বদ্ধ (খ)

(a) CV.CVC : পাজিক্ /págɨk/ (মাছি), বাহক্ /báhok/ (ধনেপাতা)
(b) CV.CV : কারক্ /károk/ (খড়ি)
(c) CVC.CVC : রাংফেক /raŋpʰek/ (বক্ষ)

(d) CCVC.CCVC : প্রেঙ্ব্রেক্ /preŋʂrek/ (সারাদেশ)

(e) CV.CCVC : মাগ্রিক্ /mágrɨk/ (দেয়াশলাই)

Disyllable এ দেখা যাচ্ছে এ ভাষার মুক্ত বা Open [ক ও খ] আর বদ্ধ বা Closed [ক ও খ]-এর Onset-এ একটি V অথবা C থাকে। কিন্তু মুক্ত বা Open syllable-এর Coda-তে একটি V হয় এবং বদ্ধ বা Closed-এর Coda-তে C থাকে।

৯.৩ Trisyllable বা ত্রি সিলেবল: মুক্ত (ক)

(a) V.CV.CV : আমারা /ámárá/ (হাড়), আঠানা /áʈʰáná/ (আগে)

(b) V.CVC.CV : আচিহ্ছা /átʃint͡ʃʰá/ (চাচা), আচাক্হে /átʃakhé/ (ভয়)

(c) V.CCVC.CV : আপ্রেক্-ফো /áprek-pʰó/ (প্রতিশোধ)

(d) V.CVC.CV : ইরাগ্হে /ɨraghé/ (সাঁতার)

(e) VC.CV.CV : আছ্কানু /át͡ʃʰkánu/ (নাক)

Trisyllable বা ত্রি সিলেবল: মুক্ত (খ)

(a) CV.CV.CV : তানাছা /tánat͡ʃʰá/ (ট্যাংরা), ছিছামা /t͡ʃʰɨt͡ʃʰámá/ (কবিরাজ)

(b) CV.CVC.CV : পাজিগ্ছা /pádʒɨgt͡ʃʰá/ (মশা)

(c) CVC.CV.CV : মুংহেকা /mɯŋhekά/ (পরাজয়)

(d) CVC.CV.CV : য়ুঙ্মাঙ্গা /ʲuŋmaŋgά/ (আস্তে)

(e) CVC.CVC.CV : চুত্তাক্সা /t͡ʃɯttákʃά/ (দুধের বাচ্চা)

(f) CVC.CVC.CV : কুঙ্লুক্হে /kɯŋlɯkhé/ (ব্যবসায়ী)

Trisyllable বা ত্রি সিলেবল: বদ্ধ (ক)

(a) VC.CVC.CVC : আছ্ড়ংমুহ্ /át͡ʃʰɽəŋmɯh/ (গোঁফ)

(b) VC.CVC.CVC : আংছিংপিক /áŋt͡ʃʰiŋpɨk/ (ফুসফুস)

(c) V.CVC.CVC : আনেকফোগ্ /ánekpʰog/ (মজ্জা)

(d) V.CV.VC : আটাঠক্ /áʈáʈʰok/ (গোড়ালি)

Trisyllable বা ত্রি সিলেবল: বদ্ধ (খ)

(a) CV.CV.CVC : ছামোহাক্ /t͡ʃʰámóhak/ (চেরাগ)

(b) CCVC.CV.CVC : ক্রাংছাথিক্ /kraŋt͡ʃʰátʰɨk/ (মেঝে)

(c) CV.CVC.CVC : পোলাগ্হেক্ /pólaghek/ (বায়ে)

(d) CVC.CV.CVC : লাক্কাধিক্ /lakkádʱɨk/ (বুগল)

(e) CV.CVC.CCVC : রানেঙ্গ্রেং /ráneŋgreŋ/ (কেরোসিন)

Trisyllable এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মুক্ত বা Open আর বদ্ধ বা Closed [ক ও খ]-এর Onset-এ একটি V অথবা C আছে। কিন্তু মুক্ত বা Open [ক ও খ]-এর Coda-তে একটি V হয় এবং বদ্ধ বা Closed-এর Coda-তে একাধিক C থাকতে পারে। বলা যায়, এ ভাষায় শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত্যে CVC সিলেবল সংগঠন অত্যাধিক।

৯.৪ Tetrasyllable বা চতুর্থ সিলেবল: মুক্ত (ক)

(a) V.CV.CVC.CV : ইরামাক্হে /ɨrámakhé/ (পিপাসা)

(b) VC.CVC.V.CV : আছ্তেক্আয়া /át͡ʃʰtekaʲá/ (কখন)

(c) V.CV.CV.CV : আপাগাছা /ápágát͡ʃʰá/ (ভাইপো)

(d) V.CV.CVC.CV : উজাফেংজা /ud͡ʒápʰeŋd͡ʒá/ (মালপত্র)

(e) VC.CVC.CVC.V : আছ্মিংদেকআ /át͡ʃʰmɨŋɗeká/ (কখন)

(f) V.CVC.CCC.CV : আরিক্স্রক্থং /árɨkroktʰəŋ/ (পূর্ব-পশ্চিমকোণ)

Tetrasyllable বা চতুর্থ সিলেবল: মুক্ত (খ)

(a) CV.CV.CV.CV : তানারাকু /tánáráku/ (শুটকিমাছ)

(b) CV.CVC.CVC.CV : ছুছাক্কিংহে /t͡ʃʰuʔt͡ʃʰakkɨŋhé/ (শ্বাস নেওয়া)

(c) CVC.CV.CVC.CV : টুংদারুগছা /ʈɯŋdárɯgt͡ʃʰá/ (বেটে)

(d) CVC.CV.CVC.CV : নাক্কিপোক্কি /nakkɨpokkɨ/ (মহামারি)

(e) CVC.CV.CV.CV : মেংছাকানা /meŋt͡ʃʰákáná/ (হাম)

Tetrasyllable বা চতুর্থ সিলেবলঃ বদ্ধ (ক)

(a) V.CVC.CV.CVC	:	আমিক্কোলাক্ /ámɨkkólak/ (চোখের পাতা)
(b) V.CVC.CVC. CCVC	:	আছাক্মুঙ্ফ্রোক্ /át͡ʃʰakmɯŋpʰrok/ (নিঃশ্বাস)
(c) V.CV.CV.CVC	:	আকানামুঙ্ /ákánámɯŋ/ (কানের কেশ)
(d) V.CV.CV.VC	:	আনেকাইন /ánekái̯n/ (কচুলতির তরকারি)

Tetrasyllable বা চতুর্থ সিলেবলঃ বদ্ধ (খ)

(a) CVC.CV.CV.CVC	:	খেংঠাকোলাক্ /kʰeŋt̪ʰákólak/ (স্বাস্থ্য)
(b) CV.CV.CV.CVC	:	মালাকারেক্ /málákárek/ (অনেকদিন আগে)
(c) CVC.CV.CV.CVC	:	নাক্তাকারেক্ /naktákárek/ (গতকাল)
(d) CV.CVC.CV.CVC	:	শারিক্মঙ্বিক্ /ʃárɨkmoŋɓik/ (রঙধনু)

Tetrasyllable-এ দেখা যায়, মুক্ত বা Open আর বদ্ধ বা Closed-এর Onset-এ একটি V অথবা C থাকলেও এর মুক্ত বা Open [ক ও খ]-এর Coda-তে একটি V; বদ্ধ বা Closed-এর Coda-তে একাধিক C থাকতে পারে। এখানে শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত্যে [CV, CVC] সিলেবল সংগঠন বেশি।

৯.৫ Pentasyllable বা পঞ্চ সিলেবলঃ মুক্ত (ক)

(a) V.CVC.CV.CV.CV	:	আমেংলুহেকা /ámeŋluhéká/ (জখম)
(b) VC.CV.CV.CV.CV	:	আহ্ভাকানহে /áhbʱákanhé/ (দাঁতের ব্যথা)
(c) V.CV.CVC.CVC.V	:	আলোবেংফংআ /álóɓeŋpʰəŋá/ (নিতম্ব)
(d) V.CV.CVC.CVC. CCV	:	আকাছাংকিংস্রা /ákát͡ʃʰaŋkɨŋrá/ (মেরুদণ্ড)

Pentasyllable বা পঞ্চ সিলেবলঃ মুক্ত (খ)

(a) CVC.CVC.CV.CVC.CV	:	নাক্তেক্ছারিংছা / naktekt͡ʃʰárɨŋt͡ʃʰá/ (বিকাল)
(b) CVC.CCV.CCVC.CVC.CV	:	নিঙ্ফ্রাফ্রেঙ্তিংতো / nɨŋpʰrápʰreŋtɨŋtó/ (নিচু)
(c) CV.CVC.V.CV.CV	:	ছালিক্উহেকা /t͡ʃʰálɨkuheká/ (ধূমপান)

(d) CV.CV.CVC.CV.CV	:	তানারিংহেকা /tánáriŋheká/ (মাছ ধরা)

Pentasyllable বা পঞ্চ সিলেবল: বদ্ধ (ক)

(a) V.CVC.CVC.VC.CVC	:	আপাংহামেক্পুক্ /ápaŋhámekpɯk/ (প্রাতঃরাশ)
(b) V.CV.CV.CV.VC	:	আপাগাছাইক্ /ápágát͡ʃʰái̯k/ (ভাইঝি)
(c) V.CVC.CV.CVC.CVC	:	আপিক্মাচেক্নুহ্ /ápɨkmát͡ʃeknɯh/ (ধাত্রী)

Pentasyllable বা পঞ্চ সিলেবল: বদ্ধ (খ)

(a) CV.VC.CV.VC.CC	:	বাঅংপাইনরং /báəŋpái̯nrəŋ/ (বেগুনি)
(b) CV.CV.CV.CV.VC	:	শাপলাপেইন্ /ʃaplápe͡i̯n/ (শাপলা)
(c) CV.CVC.CVC.CV.CVC	:	খারিক্লাংগাজেক্ /kʰárɨklaŋgád͡ʒek/ (যানবাহন)
(d) CV.VC.CV.CVC.CVC	:	ডাইনছানেঙ্কুহ্ /ɗái̯nt͡ʃʰáneŋkɯh/ (মাসকলাই)

৯.৬ Hexasyllable বা ষষ্ঠ সিলেবল: মুক্ত (ক)

(a) V.CVC.CV.CV.CVC. CCV	:	আরাংথাবাপোক্হে /áraŋtʰáɓápokhé/ (উপড়ানো)
(b) V.CVC.CVC.CVC. CV.CV	:	আপাংহামেক্চোজো / ápaŋhámekt͡ʃód͡ʒó/ (ভোর)
(c) V.CVC.CV.CCV.VC.CV	:	আতেংছাহ্রেইক্হে /áteŋt͡ʃʰáhréi̯khé/ (ঠিকঠাক)

Pentasyllable-এর মুক্ত বা Open আর বদ্ধ বা Closed-এর Onset-এ একটি V অথবা C থাকলেও Coda-তে একটি V ও একাধিক C থাকতে পারে। এখানে শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত্যে [V, CV , VC, CVC] সিলেবল সংগঠন বেশি।

Hexasyllable বা ষষ্ঠ সিলেবলঃ মুক্ত (খ)

(a) CVC.CVC.V.CV.CV.CV : নাংনুহ্আচেহেকা / naŋnɯhát͡ʃehéká/ (নিড়ানো)

Hexasyllable বা ষষ্ঠ সিলেবলঃ বদ্ধ (ক)

(a) V.CV.CVC.CVC.CVC.CVC : আপানেক্চিংয়াগ্তেক্ / ápánekt͡ʃɨŋʲagtek/ (আগামীকাল)

Hexasyllable-এর মুক্ত বা Open আর বদ্ধ বা Closed-এর Onset-এ একটি V অথবা C থাকলেও Coda-তে একটি V ও একাধিক C থাকতে পারে। এখানে বদ্ধ (খ) অর্থাৎ Onset ও Coda-তে [C----------C] C আছে এমন শব্দ চাক ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। চাক ভাষার উপর্যুক্ত Monosyllable থেকে Hexasyllable পর্যন্ত দৃষ্টান্তসমূহে সিলেবল সংগঠনের সংখ্যামাত্রা নিম্নোক্তরূপে দেখানো যায়।

সারণি-৮: চাক ভাষায় মুক্ত ও বদ্ধ সিলেবলের উপস্থিতি

সিলেবল সংখ্যা	মুক্ত	বদ্ধ
Monosyllable বা এক সিলেবল	+	+
Disyllable বা দ্বি সিলেবল	+	+
Trisyllable বা ত্রি সিলেবল	+	+
Tetrasyllable বা চতুর্থ সিলেবল	+	+
Pentasyllable বা পঞ্চ সিলেবল	+	+
Hexasyllable বা ষষ্ঠ সিলেবল	+	±

১০. ফলাফল

উপর্যুক্ত শব্দবিশ্লেষণে চাক ভাষায় উনিশ ধরনের সিলেবল-বিন্যাস মেলে- CV[1], CVC[2], CVCV[3], CVCVCV[4], VC[5], VCVC[6], VCCV[7], CCV[8], CCVC[9], VCC[10], CVCC[11], CCVCC[12], VV̯[13], VV̯CV[14], VV̯C[15], CVV̯[16], VCVV̯[17], CVV̯C[18], CCVV̯CV[19]; এর মধ্যে CV, CVC, CVCV, CVCVCV প্যাটার্নের সিলেবল সংগঠন সবচেয়ে বেশি। তবে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো চাক ভাষায়ও CV প্যাটার্ন বেশি।

চাক ভাষার সিলেবল সংগঠনে নিম্নোক্ত ফলাফল দেখা যায়:

- চাক ভাষায় স্বরধ্বনি সবসময় সিলেবলের কেন্দ্র বা Nucleus এ থাকে।
- চাক ভাষায় V̯V সংগঠন দেখা যায়।
- এর প্রথমটি পূর্ণাঙ্গ স্বরধ্বনি আর দ্বিতীয়টি অর্ধস্বরধ্বনি হিসেবে থাকে। যেমন- V̯VC = আউক্ /a͡u̯k/ (ভাসুর)
- শব্দের প্রারম্ভে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তা সিলেবল সংগঠনের প্রারম্ভক বা Onset হয়। যেমন- CCVC = হ্রাং /hraŋ/ (বৃষ্টি)
- শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তা সিলেবল সংগঠনের সমাপ্তক বা Coda হয়। যেমন- CVC.C = রগ্ছ্ /rəgt͡ʃ/ (লেবু)
- শব্দের মধ্যে ইন্টারভোকালিক যুক্তব্যঞ্জন অর্থাৎ একই শব্দে দুটি স্বরের মাঝখানে যুক্তব্যঞ্জন থাকে তাহলে হয় সেটা হোমরজেনিক বা হেটারোজেনিক হবে। এখানে সিলেবলে যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটি হয় Coda আর দ্বিতীয়টি হয় Onset। যেমন- CVC.CVC = রাংফেক্ /raŋpʰek/ (বক্ষ)

১১. উপসংহার

ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো চাক ভাষায়ও স্বরধ্বনি স্বনন-শীর্ষে আর ব্যঞ্জনধ্বনি স্বননখাদে থাকে। প্রারম্ভক বা Onset ও সমাপ্তক বা Coda এর কোনো একটি না থাকলেও দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র বা Nucleus এ স্বরধ্বনি থাকছেই। চাক ভাষায় সিলেবলের Onset এ দুটি C থাকতে পারে। অন্যদিকে, এ ভাষার সিলেবলের Coda-তে দুইটি [C] ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাস লক্ষ করা যায়।

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম মেনে বলতে গেলে চাক সিলেবলের সংগঠন দাঁড়ায়– $C_0^2VC_0^2$। এখানে, C-এর পাশে উপরের সংখ্যা (superscript) ২/২ সর্বাধিক ব্যঞ্জন (Consonant)-এর সম্ভাব্য সংখ্যা এবং নিচের সংখ্যা (subscript) ০/০ তার সর্বনিম্ন সম্ভাব্য সংখ্যা; অর্থাৎ ব্যঞ্জনের অনুপস্থিতি। চাক ভাষায় সিলেবলে V-এর বামদিকে বেশির পক্ষে দুইটি, কমপক্ষে শূন্য সংখ্যক C থাকতে পারে। আর ডানদিকেও বেশির পক্ষে দুইটি, কমপক্ষে শূন্য সংখ্যক C থাকতে পারে। চাক ভাষার দ্বিস্বরযুক্ত সিলেবল এবং অর্ধস্বরধ্বনিসহ উনিশটি সিলেবলকে নিম্নোক্ত সমীকরণে দেখানো যায়- (C) (C) V {V/C} (C)।

তথ্য-নির্দেশ

চাক, অংখ্যাই। (২০২৪)। চাক ভাষা ও লিপি। (সম্পা. অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ), *মাতৃভাষাপিডিয়া*-২য় খণ্ড (৭৩-৭৪)। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: ঢাকা।

চাক, মং মং। (২০০৩)। বাংলাদেশের চাক উপজাতি। (সম্পা. এস.এ. প্রু), *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা-সাংগু* (৬৬-৭৪)। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: বান্দরবান।

চাক, মং মং। (২০০৬)। চাক জাতির প্রাচীন ইতিহাস ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন। (সম্পা. হাফিজ রশিদ খান ও চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া), *সমুজ্জ্বল সুবাতাস* (৪০-৫২)। বান্দরবান ও চট্টগ্রাম।

চাকমা, সুগত। (২০০৯)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙ্গামাটি।

চাকমা, সুগত। (২০০০)। *চাকমা ও চাক : ইতিহাস আলোচনা*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙ্গামাটি।

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রলাল। (২০১২)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙ্গামাটি।

মজুমদার, অভিজিৎ। (২০১৯)। *ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

মজুমদার, অভিজিৎ। (২০১৯)। *ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান* । (উদ্ধৃত Lindau, Norlin (1985), Working Pars in Phonetics. UCLA). দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

সরকার, পবিত্র। (২০১১)। ধ্বনিদল সংগঠন। (সম্পা. রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার), *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*-প্রথম খণ্ড (১০২-১১০)। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

সরকার, পবিত্র। (২০২৩)। *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ*। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

Chomsky, N. & Halle, M. (1968). *The Sound Pattern of English*. Harper and Row, New York.

Clements, G. N. & Keyser, S J. (1983). *CV phonology: a generative theory of the syllable*. Cambridge, Mass.: MIT Press. Retrieved January 5, 2017.

Dan, M. (1992). *Some issues in metrical phonology: the indigenous research tradition*. Deccan College, Pune. PhD dissertation. Published as an ebook from Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysore.

Daunmu, S. (1994). *Linguistics of the Tibeto-Burman Area*, The Phonology of the Glottal Stop in Garo, Vol. 17.2

Davis, S. (1988). *Topics in syllable geometry*. New York: Garland.

Ethnologue: Language of the World (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale)

Grierson, G. (1927). *Linguistic Survey of India* (Vol-I part-I). Calcutta.

Haugen, E. (1956). 'The syllable in linguistic description' In Halle, M., Lunt, H. & McLean, H. (eds.) For Roman Jakobson. The Hague: Mouton.213-221.

Hockett, C. (1955). A manual of phonology. International Journal of Linguistics Retrieved January 5, 2017.

Jones, D. (1997). *An Outline of English Phonetics*. Kalyani Prokashani: New Delhi.

Kahn, D. (1976). *Syllable-based generalizations in English phonology. Doctoral dissertation*, MIT, Cambridge, Mass. Retrieved January 5, 2017.

Katamba, F. (1989). *An Introduction to Phonology*. London; New York: Longman.

Keisuke, H. (2016). *Cak-English-Bangla Dictionary*. A.H. Development Publishing House: Dhaka.

Kostić, D. & Das, R. S. (1972). *A Short outline of Bengali phonetics*. Calcutta: Statistical Publishing Society.

Loffler, L.G. (1964). *Chakma and Sak*. Archives International Cultural Ethnographic (Vol.1, No.1).

Malmberg, B. (1955). The phonetic basis for syllable division. *Studia Linguistics Lund*, Sweden.

Matisoff, J. (ed.). (1996). *Phonological Inventories of Tibeto-Burman Languages.* STEDT Monograph Series, No. 3, Center for Southeast Asia Studies, University of California, Berkeley, USA.

Pike, K. L. (1947). *Phonemics: A Technique for Reducing Languages to Writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press.*

Schendel, W. (ed.). (1992). *Francis Buchanon in South East Bengal (1798)*. University Press Limited Dhaka.

তথ্যদাতা

- অংখ্যই চাক (৬৬), পিতার নাম: মংসুই হ্লা চাক, মাতার নাম: পেরাং চাক; গ্রাম: বাইশারী আপার চাক পাড়া, ডাকঘর: বাইশারী বাজার (পুরাতন বড়বিল), উপজেলা: নাইক্ষ্যংছড়ি, জেলা: বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব ও বর্তমান বাস্তবতা

স্বাক্ষার ব্লেইজ গমেজ *

Abstract: The integration of language and culture among the ethnic minority communities living in Bangladesh is a crucial issue. Approximately 99% of the country's total population speaks Bangla, making it the central language of Bangladesh's institutional, social, and cultural life. Currently, there are around 50 ethnic minority communities in the country, each distinguished by their unique languages, cultures, and traditions. However, due to the influence of Bangla in national and social life, the interest and use of mother tongues among children of ethnic minorities are diminishing. The education system for these children is primarily conducted in Bangla, compelling them to learn Bangla first. As Bangla is the central language of the education system, the opportunity for ethnic minority children to receive education in their own languages is significantly limited. Moreover, since Bangla dominates as the primary medium of mass communication, literature, and social interaction, linguistic diversity within these communities is gradually eroding. As a result of this influence, children are paying less attention to their native languages, and in most cases, efforts to preserve their mother tongues are insufficient. Although learning Bangla from an early age makes them proficient in the language, they struggle to use their ethnic languages. This situation negatively impacts

* Shakhor Blaise Gomes, Senior Research Officer, SIL International Bangladesh

their cultural identity and ethnic heritage, creating a conflict with their traditional way of life. This research highlights the impact of Bangla on the lives of ethnic minority children and the challenges they face in using their mother tongues, which could have long-term effects on their culture. It suggests that the community's active involvement in the development of their languages and collective efforts for language preservation is essential. For ethnic groups without their own scripts, it emphasizes the need for children to learn their mother tongue using an adapted script while simultaneously becoming proficient in Bangla. The goal of teaching children both their mother tongue and Bangla is to ensure that they do not lose their identity while also becoming capable of receiving education and communicating effectively in Bangla. The primary objective of this research paper is to provide a comprehensive overview, through ethnographic research, of the current state of mother tongue and Bangla practice among ethnic minority communities and the necessity of multilingual education.

মূলশব্দ (Keywords): ভাষার বৈচিত্র্য, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, বহুভাষিক শিক্ষা।

১. ভূমিকা

ভাষা মানব সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি সামাজিক পরিচয়ের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে এবং একই সাথে ভাষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার মনের ভাব খুব সহজে প্রকাশ করে থাকে। ভাষা শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয় নয় এর মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় অন্যের কাছে তুলে ধরে। মাতৃভাষার প্রভাব একজন ব্যক্তির জীবনে আলাদাভাবেই গুরুত্বপূর্ণ বহন করে, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে ব্যক্তির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয় জড়িত থাকে। মাতৃভাষার গুরুত্ব অধ্যয়ন করা হয় এ কারণে যে, প্রতিটি শিশু যখন তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে, তখন তারা একইসঙ্গে যোগাযোগ এবং সাক্ষরতা দক্ষতার মতো অন্যান্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার পুরো বিষয়গুলোকে নিজেদের মধ্যে আয়ত্ব করে। মাতৃভাষার শিক্ষা গুরুত্ব শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি শিশুকে তার দ্বিতীয় কোনো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু যখন তার মাতৃভাষায় যথাযথভাবে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, তখন সেই শিশু যখন বাংলা ভাষায় শিক্ষা অর্জন করবে তখন সে বাংলা

অর্থ খুব সহজে বুঝতে পারে। শব্দের অর্থ অনুমান করার ক্ষমতা বা দক্ষতা গড়ে উঠে, তবে মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করে দ্বিতীয় ভাষায় অধ্যয়ন শুরু করলে তখন সহজেই এই দক্ষতাগুলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব ও বর্তমান বাস্তবতা অন্বেষণের জন্য নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (participant observation) এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (interviews), দলীয় আলোচনা (Focus group discussion) প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষক মাঠপর্যায়ে সরাসরি নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষার সাথে সংযুক্ত হয় এবং তাদের ভাষাগত পরিচয়ে বাংলা ভাষার প্রভাব কীভাবে কাজ করে, তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন বয়সের শিশু, তাদের পরিবার ও কমিউনিটির প্রভাবশালী সদস্যদের সাথে গভীর সাক্ষাৎকার (in-depth interview and key informant interview) নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জায়গাভিত্তিক নোট, অডিও-ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টেশন এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

শিশুদেরকে মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্য হলো যেন তাদের পরিচয় না হারিয়ে যায় এবং একই সাথে বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব, বর্তমান বাস্তবতা এবং মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার বর্তমান চিত্র তুলে ধরা। এছাড়াও নিম্নলিখিত আরো কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হলো:

৩.১ ভাষাগত প্রভাব মূল্যায়ন: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার কী ধরনের প্রভাব রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা। এটি তাদের ভাষা শেখা, দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির উপর কেমন প্রভাব ফেলছে তা বোঝা।

৩.২ বাংলা ভাষার গ্রহণযোগ্যতা: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা বাংলা ভাষাকে কীভাবে গ্রহণ করছে, তা নির্ধারণ করা। এতে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের মনোভাব, শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে ভাষার স্থান নির্ধারণ করা।

৩.৩ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার অবস্থা: বাংলা ভাষার প্রচলনের কারণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাগুলোর অবস্থার কী পরিবর্তন হচ্ছে বা সেই ভাষাগুলো রক্ষা

ও প্রচলনের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা খুঁজে বের করা।

৩.৪ বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা: বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের সংস্কৃতি ও পরিচয় কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা।

৩.৫ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব: শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার প্রধান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষাগত উন্নয়নে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা খতিয়ে দেখা।

এই গবেষণার মাধ্যমে মূলত বাংলা ভাষার প্রসার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে এর বাস্তবিক প্রভাব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া গেছে।

৪. গবেষণার পটভূমি

১৫টি জাতিগোষ্ঠীর ওপর গবেষণা কাজের প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে দ্বিভাষার চর্চা রয়েছে। এছাড়াও এই জাতিগোষ্ঠীর ভাষা নানাভাবে হুমকির সম্মুখীন আবার কোনোটি বিপন্নতার পথে। অর্থাৎ দেখা যায় যে এই সকল জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা তাদের মাতৃভাষা শেখার সুযোগ পাচ্ছে না আর যার ফলে শিশুরা মাতৃভাষায় যোগাযোগে দক্ষতা অর্জন করছে না। ঠিক একইভাবে মাতৃভাষা শিখার সুযোগ পাচ্ছে না বলে বাংলা ভাষাতে তারা দক্ষ হয়ে উঠছে না। এই সকল জাতিগোষ্ঠীর শিশু বাংলা ভাষা ব্যবহারে ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কেননা আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সিলেট, মৌলভীবাজার, ও হবিগঞ্জ জেলার চা-বাগানে যে সকল নৃ-গোষ্ঠী বাস করে তাদের মধ্যে মাতৃভাষা ছাড়াও একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাষার চর্চা রয়েছে। এই ভাষাকে চা-বাগানের জাতিগোষ্ঠীরা বাগানিয়া ভাষা অথবা জংলি ভাষা বলে। চা-বাগানে শিশুরাও এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে আসছে। ফলে দেখা গেছে যে, শিশুরা তাদের মাতৃভাষা যথাযথভাবে শেখার সুযোগ পাচ্ছে না। আবার এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করার ফলে শিশুরা বাংলা ভাষা ব্যবহারে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। কেননা দ্বিতীয় ভাষা শেখার যে ব্রিজিং তার সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। যেমন– উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, বানাই ও পাত্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা নিজেদের মধ্যে শুধু যোগাযোগের জন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মাতৃভাষা শেখার সুযোগ তাদের নেই। যার ফলে শিশুরা যখন প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলে যাচ্ছে তখন তারা বাংলা ভাষা পুরোপুরি বুঝতে পারে না, অনেক শব্দের অর্থ তারা বুঝতে পারে না এবং শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। বাংলা ভাষা সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণের মধ্যে একটি কারণ হলো মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। আর তাই একটি সময় পর এই জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা আর স্কুলে যেতে চায় না।

৫. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ভাষাগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষার ভাষার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ হলো ভাষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ যেখানে মূলধারার জাতিগোষ্ঠীর সাথে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো, ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি নিয়ে স্মরণাতীতকাল থেকে এই বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হলো ৫০টি। ২০১১ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর তথ্য মতে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা হলো ১,৫৮৬,১৪১ যা মোট জনসংখ্যার ১.৮% ভাগ। এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং দক্ষিণাঞ্চলের পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউটের তথ্য মতে বাংলাদেশে বাংলা ব্যতীত ৩৯টি ভাষা প্রচলন রয়েছে যে ভাষাগুলো সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

৬. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের মাতৃভাষা শেখার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষা এবং বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে না পারার পেছনে জন্য নানা ধরনের কারন রয়েছে যা কিনা *আমার ভাষা, আমার পরিচয়* নামক গবেষণার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীদের মত আমাদের এই ১৫টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নানা পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, মালো, মুশহর, রাজোয়ার, ভূঁইমালি, হুদি, তেলি, তুরি ও বানাই জাতিগোষ্ঠী বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার সমতল ভূমিতে বসবাস করে। তারা নানা ধরনের পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৮৫% মানুষ নানাভাবে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত এবং বাকি ২৫% লোক অন্যান্য পেশা যেমন– চাকরি, শিক্ষকতা, হস্তশিল্প, জেলে, নাপিত, মুচি ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত। একইভাবে এই গবেষণার একটি বড় অংশ বাংলাদেশের চা-বাগানে বসবাস করে। তথ্যদাতাদের মতে দেখা যায় যে, বাড়াইক, বাগদি, ভুমিজ, গঞ্জু, কন্দ, খাড়িয়া, তেলি, তুলি ও মুশহর সম্প্রদায় চা-বাগানে বাস করে। যাদের মধ্যে প্রায় ৮৫% লোক চা-বাগানিয়া, অর্থাৎ তারা চা-বাগানে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। এদের মধ্যে বাকিরা নানা পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে (Gain, 2016)।

গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিলক্ষিত বিষয় হলো, এই ১৫টি জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকের অর্থনৈতিক চিত্র প্রায় সহ-অবস্থানে রয়েছে। গবেষণার তথ্য মতে, প্রতিটি সম্প্রদায়ের ৮০-৮৭% পরিবারের দৈনিক আয় ১০০-২০০ টাকা মাত্র যা কিনা বর্তমান পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় খুবই কম। বিশেষ করে যারা চা-বাগানিয়া

তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি নাজুক ও ভঙ্গুর। তাদের বর্তমান দৈনিক মজুরি ১৭০ টাকা। ফলে দেখা যায় যে জীবন-জীবিকার তাগিদে ছুটতে গিয়ে তাদের কাছে তাদের শিশুদের মাতৃভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারছে না বললেই হয় (*আমার ভাষা, আমার পরিচয়*, ২০২৩)।

শিক্ষা একটি জাতিগোষ্ঠীর তথা জাতির মেরুদণ্ড শক্তপোক্তভাবে গড়ে-উঠতে সহায়কের ভুমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা এখনো শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃহত্তর সম্প্রদায় থেকে ঢের পিছিয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, সচেতনতার অভাব, সুবিধা বঞ্চিত ইত্যাদি নানাবিদ কারণে এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যা কিনা তাদের ভাষাকে বিপন্নতার মুখে ফেলে দিতে ভূমিকা পালন করছে। জাফলং চা-বাগানের ভাগ্য কন্দ বলেন আমাদের সাধ আছে, সাধ্য নেই।

আমরা চাই আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমাদের মাতৃভাষায় (উড়িয়া) শিক্ষা গ্রহণ করবে, এই ভাষায় কথা বলবে কিন্তু আমরা পারছি না (*আমার ভাষা, আমার পরিচয়*, ২০২৩)।

এছাড়াও আরো নানা কারণ রয়েছে যা হলো– ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠানিক মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। এই শিশুরা শুধু তাদের পিতা-মাতা বা বয়স্কদের কাছ থেকে ভাষা মৌখিকভাবে শিখছে। যার ফলে ভাষা সঠিকভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে না। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাসের অঞ্চলে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষার উপযুক্ত অংশগ্রহণ এবং বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা কম রয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয় না এবং তাদের মাতৃ ভাষা বাংলা নয়। এই কারণে ভাষার অভাবের কারণে তারা সঠিকভাবে বাংলা ভাষা শিখতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

৭. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব ও বর্তমান বাস্তবতা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব এবং বর্তমান বাস্তবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অন্যান্য ভাষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। মাতৃভাষা শিশুদের জন্য অন্যান্য ভাষা বাছাই এবং শিখতে সহজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাঙালি শিশুরা আগে শৈশব থেকেই তাদের মাতৃভাষা শেখার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে বলেই তাদের শব্দভাণ্ডার এবং ভাষাদক্ষতা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের থেকে বেশি থাকে এবং তাদের অন্যান্য আরো কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। মাতৃভাষা ব্যবহার শিশুকে তাদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং শিক্ষার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা তাদের মাতৃভাষায়

শিক্ষা গ্রহন ও ব্যবহারের মাধ্যমে সংস্কৃতি, সামাজিক অবস্থা পাকাপোক্ত করবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলছে। বিশেষ করে মালো, মুশহর, রাজোয়ার, ভূঁইমালি, হুদি, তেলি, তুরি, পাত্র ও বানাই জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা যেহেতু তাদের মাতৃভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পায় না, সেহেতু তারা তাদের মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ও হয়ে উঠছে না কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হলো এই সকল শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম আর তাদের জীবনে বাংলা ভাষার উন্নয়নের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো এই জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন।

গবেষণায় দেখা যায় যে, বানাই, বাড়াইক, কন্দ, গঞ্জু, খাড়িয়া, তেলি, তুরি, পাত্র, মুসহর এবং মালো জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের বাংলা ভাষার অবস্থা অনেকটাই নাজুক। একইভাবে সিলেটের "পাত্র" জাতিগোষ্ঠীতে দেখা যায় যে শিশুরা তাদের মাতৃভাষা "লালেংথার" ভাষায় শুধু মৌখিকভাবে ব্যবহার করে কিন্তু তারা লিখতে পারে না। এর কারণ হলো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম নেই। এই শিশুরা যখন স্কুলে যায় তখন তারা বাংলা ভাষা তুলনামূলকভাবে কম বুঝতে পারে। পিংকী পাত্র বলেন, "শিশুরা বাড়িতে মাতৃভাষায় কথা বলে ফলে তারা বাংলা খুবই কম ব্যবহার করে থাকে। আর এর প্রভাব স্কুলে গেলে দেখা যায়। তখন শিশুরা আর শিক্ষকদের কথা বুঝতে পারে না। এক সময় শিশুরা আর স্কুলে যেতে চায় না।"

সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর উপজেলার, মোহনপুর গ্রামে বানাইরা বসবাস করে। সেই গ্রামের লুদুর সিং বানাই, বলেন আমাদের মাতৃভাষা হলো বানাই ভাষা। আমাদের শিশুরা এই ভাষায় কথা বলতে পারে। তারা বাড়িতে সবসময় বানাই ভাষায় কথা বলে। যার ফলে তারা বাংলা ভাষা কম ব্যবহারের ফলে স্কুলে গেলে বাংলা ভাষা বুঝতে পারে না।

ঠিক এর ভিন্ন চিত্র দেখা যায় সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার চা-বাগানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গুলোর শিশুদের ক্ষেত্রে। চা-বাগানগুলোতে বাড়াইক, কন্দ, গঞ্জু, খাড়িয়া, তেলি, তুরি, মুসহর, রাজোয়ার, বাগদি, ভুমিজ জাতিগোষ্ঠীদের বসবাস। এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর শিশুরা তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের চেয়ে তাদের মধ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। কেননা এই চা-বাগানে "বাগানিয়া ভাষা" বা "জংলি ভাষা" নামের একটি সার্বজনীন মিশ্র ভাষার প্রচলন রয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় অথবা বাংলা ভাষায় যোগাযোগ না করে তারা বাগানিয়া ভাষা ব্যবহার করে যাচ্ছে। ফলে এই শিশুরা যখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য স্কুলে যায় তখন বাংলা ভাষা রপ্ত করতে জটিলতায় পড়ে যায়। যার প্রভাব পরবর্তী কালে দেখা যায়, শিশুরা শিক্ষা প্রতি

আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বাংলা ভাষার প্রতি তাদের একধরনের ভয় কাজ করে। খাড়িয়া জনগোষ্ঠীর শিশুরা এখন আর তাদের মাতৃভাষা (ফার্সি ভাষা) ব্যবহার করছে না। তারা বাগানের মিশ্র ভাষা আবার অনেক বাগানে সাদ্রি ভাষা চর্চা করে আসছে। যার ফলে তারা মাতৃভাষা এবং বাংলা কোনো ভাষাই শিশুরা শুদ্ধভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। এই সমস্যার একটি প্রধান কারণ হলো শিশুরা তাদের মাতৃভাষা শিখছে না। আর মাতৃভাষা ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষা রপ্ত করা শিশুদের জন্য কঠিন।

৮. মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ও এর গুরুত্ব

শিক্ষা শব্দটির অর্থ হলো– জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই হলো শিক্ষা। বিশদ অর্থে বলতে গেলে– শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কোনো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সকল দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করে থাকে। অর্থাৎ যে জ্ঞান মানুষকে তার জীবন পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে যে সকল দক্ষতার প্রয়োজন তা অর্জন করতে সহায়তা করে থাকে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা এমন হওয়া প্রয়োজন যা এই জ্ঞান লাভের মাধ্যমকে সহজতর করবে। শিক্ষা যে শুধুমাত্র মানুষকে অক্ষর জ্ঞান লাভেই সহায়তা তা নয়, বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ, মানসিক বিকাশ, মননশীলতা এবং পরিপূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষাই হলো একমাত্র পন্থা। সহজভাবে বলতে, শিক্ষা মানুষকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার পাশাপাশি তার জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা যদি বোধগম্য না হয়ে থাকে, তাহলে সেই শিক্ষা থেকে কোনো জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষ সবচেয়ে আগে যে ভাষায় কথা বলতে এবং বুঝতে শেখে তা হলো তার নিজের মায়ের ভাষা। এই ভাষা সে তার জন্মলগ্ন থেকেই তার মায়ের মুখে শুনে অভ্যস্ত হয় এবং অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য এই ভাষার ব্যবহারেই সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা যদি মাতৃভাষা হয়, তাহলে শিক্ষালাভের যে মূল উদ্দেশ্য রয়েছে তা অর্জন করা সহজতর হয়ে যায়।

মানুষের জীবনে শিক্ষালাভের সর্ব প্রথম স্তর হলো প্রাক-প্রাথমিক স্তর। এইসময় একজন শিশুর নতুন পরিচয় ঘটে, সে শিক্ষার্থীর পরিচয় লাভ করে। সে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শুরু করে। এই শিক্ষা তার মানবিক গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর শিশুরা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরেই যে কারণে বাধাগ্রস্থ হয় সেটি হলো ভাষা। বাংলাদেশে প্রচলিত দাপ্তরিক বা জাতীয় ভাষা হলো বাংলা যা দেশের সকল স্তরের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই সকল

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের কাছে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমটি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। শিক্ষাজীবন শুরুকালেই তার কাছে তার বিদ্যালয়, শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তকসহ তার সহপাঠীরাও তার কাছে এশটি দুর্বোধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এই অজানা জগৎকে আবিষ্কার করার জন্য তার যে চাবিকাঠির প্রয়োজন তা হলো ভাষা – যা তার পরিচিত নয়। তাই তার অজানা জগৎ তার কাছে অজানাই থেকে যায়।

বহুভাষিক শিক্ষা মানে হলো প্রথম ভাষায় বা মাতৃভাষায় প্রথম শিক্ষা অর্থাৎ এটি এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুরা তার মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ শুরু করে এবং সময়ের সাথে সাথে বিজ্রিং পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অন্য ভাষায়ও শিক্ষা লাভের জন্য সাহায্য করা হয়ে থাকে। এই শিক্ষা পদ্ধতি সেসকল দেশের জন্য প্রযোজ্য যেখানে ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। বাংলাদেশের মতো এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এই বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমটি প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউগিনি, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভারত, পাকিস্থান, সলমোন আইল্যান্ড, চীনসহ বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশে এলআইএল ইন্টারন্যাশনাল মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে আসছে।

৯. বহুভাষিক শিক্ষার সুফল

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমটি একটি জনপ্রিয় শিক্ষা পদ্ধতি। কেননা এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেসকল জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী এবং শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলা যায় যারা মূলধারার জনগোষ্ঠী থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এই শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাদের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত যে ভিন্নতা রয়েছে তা ধরে রাখার পাশাপাশি সফলভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যহত রাখতে পারে। এই বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনেকগুলো সুফল রয়েছে।

৯.১ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিঃ বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যেহেতু শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাই শিশু সহজেই শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে যা পড়ান তা বুঝতে পারে এবং তার নিজের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করতে পারে। শিশুর জন্য জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তা বাস্তবিক জীবনে ব্যবহারের সুযোগ পায়। শিশু সহজেই মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে চিন্তা-ভাবনা শিক্ষকের সাথে সহভাগিতা করতে পারে যা তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

৯.২ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধঃ যখন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে এমন একটি ভাষার ব্যবহার করা হয় যে ভাষার সাথে শিশু

পরিচিত নয় তখন সে ক্লাসের কোনো বিষয়ের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। ফলে ক্লাসে যা শেখানো হয় তা তার জন্য একটি অব্যবহারযোগ্য একটি জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করা বা সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করে নতুন কোনো কিছুকে আবিষ্কার করা তার কাছে মূল্যহীন। ফলে শিশু পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তি তার ভিতরে যে হীনমন্যতাবোধ তৈরি করে তারই ফলশ্রুতিতে সে একসময় সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমে যেহেতু শিশুর পরিচিত ভাষাকে ক্লাসে ব্যবহার করে পড়ানো হয় তাই শিশু সহজেই বিষয়গুলো বুঝতে পারে এবং তার পরিচিত জগৎ এর সাথে তুলনা করার মধ্য দিয়ে জ্ঞান আরোহণের পাশাপাশি নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে যা শিশুকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। স্কুল এবং বাড়িতে যে ভাষার ব্যবহার হয় তা একই হওয়ার ফলে শিশুর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার পরিবার এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা সমান ভূমিকা পালন করতে পারে।

৯.৩ বুদ্ধিমত্তার বিকাশ: দেখা যায় যে, শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক স্তরেই মাতৃ ভাষায় শিক্ষা লাভ করে থাকে এবং ধীরে ধীরে ২য় বা জাতীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা অধিক সফলভাবে অবদান রাখতে পারে। এই সব শিশুরা অধিক কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী, আত্মবিশ্বাসী, আত্মসম্মানী, শেখার ও স্কুলের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, বাচনভঙ্গি এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে থাকে। অপরদিকে যারা ২য় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল যেহেতু করতে পারে না, তাই তাদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সঠিকভাবে ঘটে না। হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা, পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহত বৃদ্ধি, পড়াশোনার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসহ আরো নানা ধরনের মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের।

৯.৪ সামাজিক ও জাতীয়গতভাবে উপকারিতা: বহুভাষিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশু যা একটি কার্যকরী শিক্ষা লাভ করতে পারে যা পরবর্তীকালে তাকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এই শিক্ষাকে ব্যবহার করে সে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে যে শুধুমাত্র নিজের উন্নতি সাধন করে তা নয় বরং দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অসীম। কেননা মাতৃভাষা ছাড়া আমাদের কারো পরিচয় টিকে থাকবে না। সুতরাং প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ তার যাত্রার শুরু থেকে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নিয়ে মাতৃভাষা ভিত্তিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। কেননা বাংলাদেশি হিসেবে প্রতিটি শিশুর জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব জড়িয়ে আছে। আর যখন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা মাতৃভাষায় সাবলীল হবে তখন বাংলা ভাষায় তাদের দক্ষতা এমনিতেই তৈরি হবে। এই ক্ষেত্রে বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে এই গবেষণা পত্রে বহুভাষিক শিক্ষার উপকারিতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০. উপসংহার

গবেষণার পত্র "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব ও বর্তমান বাস্তবতা" নতুন গবেষণার সুযোগ তৈরি করেছে নানাদিক থেকে। এই গবেষণার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাগত অধিকার, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ কীভাবে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নতুন গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হতে পারে:

- দ্বি-ভাষিক শিক্ষার প্রভাব: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষা এবং বাংলা ভাষা উভয়কেই সমানভাবে শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে প্রভাবিত করা যায় তা নিয়ে আরও গবেষণা করা যেতে পারে।
- আদিবাসী ভাষার সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন: বাংলা ভাষার প্রসার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে কীভাবে প্রভাবিত করছে এবং তার থেকে এই ভাষাগুলোর পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণার সুযোগ তৈরি করেছে।
- ভাষার সাংস্কৃতিক প্রভাব: বাংলা ভাষার শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে তাদের অবস্থান বিশ্লেষণ করার সুযোগ রয়েছে।
- পাঠ্যক্রম ও ভাষা নীতি: বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং সরকারিভাবে প্রণীত ভাষানীতি কীভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের উপর প্রভাব ফেলে এবং তা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনে বাংলা ভাষার প্রভাব এবং বর্তমান বাস্তবতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল একটি বিষয়। এ গবেষণায় উঠে এসেছে যে, বাংলা ভাষা একদিকে শিশুদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির উপরও গভীর প্রভাব ফেলছে।

বাংলা ভাষার প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগও নেওয়া প্রয়োজন। মাতৃভাষা ভিত্তিক দ্বি-ভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দুটি ভাষার মধ্যে একটি সুষম সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভাষানীতি পুনর্বিবেচনা করা উচিত যাতে সকল শিশুর মাতৃভাষার বিকাশ এবং শিক্ষায় অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত হয়। এ গবেষণা ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণ ও নতুন শিক্ষা কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তথ্য-নির্দেশ

ব্রাডলেজ, ডি. জি এবং ব্রাডলেজ, এম.। (২০১৯)। *ভাষার বিপন্নতা*। ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

Kelsall, J. & Kilgo, K. (1994). *A Sociolinguistic Survey of the Sadri-Speaking Peoples of Bangladesh*. Kathmandu: Nepal.

Gain, P. (ed.). (2016). *Lower Depths: Little-Known Ethnic Communities of Bangladesh*. Society for Environment and Human Development (SEHD): Dhaka.

Gain, P. (ed.). (2016). *On the Margins: Images of Tea Workers and Ethnic Communities*. Society for Environment and Human Development (SEHD): Dhaka.

কেইন, ব্রু.। (১৯৮৮)। *ওরাওঁ সাদরি: বাংলাদেশের একটি ভাষা জরিপ প্রতিবেদন*।

গমেজ, বি. স্বা. এবং বিটান, ই. এফ.। (২০২৩)। *আমার ভাষা, আমার পরিচয়*। (২য় খণ্ড)।

Ethnologue. (2009). *Language of the World*. Retrieved: www.ethnologue.com/nearLyextinct.asp.

Kashoki, M. E. (1998). Language Policy in Multilingual Countries Vis-A-Vis Language Maintenance, Language Shift and Language Death. *The Journal of Humanities* (Lusaka), 2: 41-62.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা পত্রিকায় (বাংলা) প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম

প্রেরিতব্য প্রবন্ধের বিষয়

- বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের মাতৃভাষা পরিস্থিতি;
- টেকসই উন্নয়ন ও মাতৃভাষা;
- ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেন্ডার;
- মাতৃভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান;
- মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান;
- সমাজ ভাষাবিজ্ঞান;
- বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষাব্যবস্থাপনা;
- সাহিত্য ও ভাষা;
- গণমাধ্যম ও মাতৃভাষার ব্যবহার;
- শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাতৃভাষার গুরুত্ব;
- ভাষা ও সংস্কৃতি;
- বহুভাষিক রাষ্ট্রে ভাষিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমে ভাষাপরিকল্পনা;
- ভাষার নথিবদ্ধকরণ (Documentation), ভাষা-সংরক্ষণ (Preservation) ও প্রমিতায়ন (Standardization), মাতৃভাষায় অভিধান প্রণয়ন, শিশুপাঠ্য বই (Primer) রচনা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে মাতৃভাষার ব্যবহার;
- লিখনব্যবস্থা নেই এমন মাতৃভাষার লিখনব্যবস্থা প্রবর্তন, মাতৃভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও বাগর্থতত্ত্ব (Semantics)।

প্রবন্ধ কাঠামো

শিরোনাম (Title)

সারসংক্ষেপ (Abstract)

মূলশব্দ (Keywords)

ভূমিকা (Introduction)

গবেষণা সমস্যার সনাক্তকরণ/সমস্যার বিবৃতি (Identification of Research Problem/Statement of the problem/Statement of the Topic)

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the research)

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ (Literature review)

গবেষণার যৌক্তিকতা (Research Rational)

গবেষণা-প্রশ্ন (Research Questions)

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো (Research theoretical framework)

গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা (Discussion)

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল (Results and Findings of the research)

সুপারিশমালা (Recommendation)

উপসংহার (Conclusion)

তথ্য-নির্দেশ (References)

বি. দ্র. Reference System APA 7th edition অনুসরণ করুন।
রেফারেন্স সিস্টেমের লিংক: **https://imli.portal.gov.bd/site/page/94efd24a-fa62-44c2-a16e-4a972b57c4b6/-**

লেখার নিয়ম

১ প্রবন্ধ অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখিত, অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

২ প্রবন্ধের সঙ্গে ইংরেজিতে Abstract বা সারসংক্ষেপ (ন্যূনাধিক ১৫০-২০০ শব্দে) বাম ও ডান দিকে ১/২ (.৫) ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে ও মূলশব্দ (Key words) বাংলায় ১৪ পয়েন্টে থাকতে হবে।

৩ প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'ইউনিকোড' (যে কোনো ফন্ট) ফন্টে ১.৫ লাইন-ব্যবধান অনুসরণ করে কম্পোজ করতে হবে।

হার্ডকপি জমা দেওয়ার সময় একপাশে প্রিন্ট করে দুই(২) সেট জমা দিতে হবে।

৪ মূল পাঠে সারণি (table) ও চিত্র থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যেমন: ১,২,৩...) প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) জরুরি।

৫ প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতিটি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাম ও ডান দিকে ১/৪ (.২৫) ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে নতুন অনুচ্ছেদে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অক্ষুন্ন থাকবে।

৬ বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত আধুনিক বাংলা অভিধান-এর বানান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না।

৮ মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে তা মূল পাঠের শেষে অন্ত্য-টীকায় (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দিয়ে ১, ২, ৩ ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

৯ অন্য কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম:

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হুমায়ুন আজাদ-এর বাক্যতত্ত্ব বইয়ের ২০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হবে:

ছাত্রদের বাক্যবোধ জাগানোর চেষ্টা বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে খুব প্রবল নয়; কিন্তু পশ্চিমে এ-চেষ্টা অন্তহীন। সেখানে শিক্ষার্থীদের মনে বাক্যবোধ সৃষ্টির নিরন্তর চেষ্টা চালানো হয়, ও শুদ্ধ বাক্য রচনার কৌশল শেখানো হয় নিত্য অভিনব উপায়ে। তবুও ত্রুটি ঘটে, যা অনেকে লালন করে সারা জীবন (আজাদ, ১৯৮৪: ৮)।

১০ গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্য-নির্দেশে সকলের নাম থাকতে হবে।

১১ প্রকাশিত কিংবা প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা গ্রহণ করা হয় না।

১২ প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত

দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার দুটি কপি এবং তাঁর লেখার ৫ কপি অফপ্রিন্ট পাবেন।

১৩ লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।

১৪ নির্বাচিত কোনো প্রবন্ধ স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না হলে তা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

১৫ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে আমাই কর্তৃক নির্ধারিত রেফারেন্স অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় লেখা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে না। আমাইয়ের রেফারেন্স পদ্ধতি www.imli.gov.bd ঠিকানায় প্রকাশনা অংশে দেওয়া আছে।

১৬ প্রবন্ধে মূল পাঠের শেষে একটি তথ্য-নির্দেশ (reference) থাকবে। এই তথ্য-নির্দেশে কেবল মূল পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তা বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তথ্য-নির্দেশ রচনা করতে হবে, যেখানে প্রথমে বাংলা বই স্থান পাবে। এছাড়া পত্রিকার উল্লেখ থাকলে তা বইয়ের নামের পরে যাবে। তথ্য-নির্দেশের ক্ষেত্রে (hanging) ১/২ (.৫) ইঞ্চি হবে । রচনার নিয়ম নিম্নরূপ:

গ্রন্থ

রাজীব, হুমায়ুন। (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

Hai, Muhammad Abdul. (1960). *A Phonetic and Phonological Studz of Nasals and Naslization in Bengali.* The University of Dhaka.

১. একক লেখকের ক্ষেত্রে

সরকার, পবিত্র। (১৪০৫)। *ভাষা, দেশ, কাল*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলিকাতা।

২. দুইজন লেখকের ক্ষেত্রে

চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব। (২০০৪)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

৩. দুইয়ের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে

খান, শামসুজ্জামান, ইসলাম, আজহার ও হোসেন, সেলিনা (সম্পা.)। (১৯৮৫)। *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

৪. সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ

রফিক, আহমদ। (২০২১)। ভাষা ও শব্দের ইতিহাস-প্রতিমা। সাজ্জাদ আরেফিন (সম্পা.), *একুশের কবিতা পরিচয়*। প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

৫. গবেষণা জার্নাল থেকে প্রবন্ধ

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৩২৪)। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ২৪শ ভাগ (১৩২৪), ২১৩-২৫২। [১৯১৭]

৬. লেখকহীন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেন [কারাস]। (২০২১)। *জীবনযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭. একই বছরে একই লেখকের প্রকাশিত একাধিক প্রকাশনা

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১ক)। *খেলারাম খেলে যা*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১খ)। *মেঘ ও মেশিন*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১গ)। *ইহা মানুষ*। শিখা প্রকাশনী: ঢাকা।

৮. অনলাইন/ইন্টারনেট উৎস থেকে

রায়, কৃষ্ণা। (জানুয়ারি ৯, ২০২২)। সৃজনশিল্পী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী এবং ওকাকুরা কাকুজো। *দৈনিক আনন্দবাজার*। প্রবেশ ৭ই জুলাই ২০২৪, **https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/special-write-up-about-priyam vada-devi-and-his-love-towards-rabindranath-tagores-poem/cid/1322644**

৯. লেখকহীন এবং তারিখহীন উল্লেখ

Pet therapy. (n.d.). Retrieved from **http://www.holisticonline.com/ stress/stress_pet-therapy.html**

১০. গবেষণা পত্রিকা

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০০৮)। "বাংলা কর্মবাচ্য: গঠন বিশ্লেষণ"। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১১. ব্লগ পোস্ট থেকে

আহমেদ, বখতিয়ার। (২০১৩)। ভাষা সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রশ্নে আমাদের জাতিরাষ্ট্র। [ব্লগ পোস্ট]। নেয়া হয়েছে ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪, **https://rashtrochinta.org/blog-post/ভাষা-সংস্কৃতি-ও-জাতিসত্ত/**

১২. অভিধান থেকে

ক. সরাসরি অভিধান

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সঙ্ক.)। (১৯৯৮)। *সংসদ বাংলা অভিধান* (দ্বাবিংশতিতম মুদ্র.)। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

খ. অনলাইন

Cambridge dictionaries online. (2011). Retrieved from **http://dictionary.cambridge.org/**

১৩. ভিডিও/ডিভিডি/ইউ টিউব থেকে

Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.

১৪. ম্যাগাজিন/সাময়িকী থেকে

করিম, মীর রেজাউল। (২০২৪)। এত বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী হবে? পড়েই বা কী লাভ হচ্ছে? *দৃষ্টি*, ১।

১৫. দৈনিক পত্রিকা থেকে

রহমান, মিজানুর। (মার্চ, ২০২২)। ১৩৫ মনের মুক্তিযোদ্ধা সনদের তথ্যে গরমিল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৩।

ইউক্রেন যুদ্ধে বিদেশি যোদ্ধা পাঠাচ্ছে পুতিন। (২০২২, মার্চ ১৩)। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৭।

১৬. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

নেছা, করিমন। (২০১৪)। বাংলা কোড সংহিতা: একটি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণা (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৭. পুস্তিকা/ব্রোশিউর/বুকলেট

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (২০১০)। International Mother Language Institute (IMLI) [ব্রোশিউর]। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: ঢাকা।